সম্মাননা

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত এম্-আর্-এ-এস্

লক্ষ্মী-নিবাস
বাগবাজার, কলিকাতা

প্রকাশক—

শ্রীরামশঙ্কর দত্ত,

'সঙ্ঘ'-কার্য্যালয়,

২৪-এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা

১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৮

১৮ই অক্টোবর, ১৯৩১

মূল্য আট আনা

প্রিন্টার—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে,

শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার, কলিকাতা

সম্মাননার লেখক কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির ও মহীয়সী মহিলার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহাদের প্রয়াণকালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন—আজ সেগুলি একত্র করিয়া 'সম্মাননা' নামে প্রকাশিত হইল। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়-গণের স্মৃতির সম্মান যথাকালে কয়েকটী শোকগাথায়ও প্রদত্ত হয়, সেগুলি তাঁহার 'বন্দনা'য় ও 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। তা'ই এ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্মান কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রকাশের তাড়াতাড়িতে ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতি-সভার সভাপতির নাম ভুল ছাপা হইয়াছে—ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু (পরে স্যার্, কে-সি-আই-ই) মহাশয় এবং মহাত্মা প্রিয়নাথের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র স্মৃতি-সভায় পরিষদ্-কর্ণধার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লেখকের ভয় আছে যে—হয়ত তিনি অনেক স্থলে শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষগণের চিত্র সঠিক অঙ্কিত করিতে পারেন নাই—তজ্জন্য তিনি মার্জ্জনা-প্রার্থী।

লেখকের পরম আত্মীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম্-এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত কমলাপতি মুখোপাধ্যায় বি-এস্‌সি মহাশয়গণ পুস্তক-প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন—তজ্জন্য লেখক তাঁহাদের নিকট ঋণী।

শারদীয়া

মহাসপ্তমী, ১৩৩৮

শ্রীরামশঙ্কর দত্ত

(প্রকাশক)

সূচীপত্র

—০OO০—

সম্মাননা

সুহৃদ্বর ৺বিপিনবিহারী *

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear :
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air."

(Gray)

বংশ-পরিচয়

কলিকাতায় বাগবাজার একটী সুপ্রসিদ্ধ পল্লী। বহু প্রাচীন সময় হইতে এই পল্লীতে অনেক সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বংশাবলীর বাস। এই পল্লীতে 'বাগবাজার ষ্ট্রীট' নামক রাস্তার উপর 'বসুপাড়া' পল্লীর পশ্চিমে, অধুনাবিলুপ্ত এক বৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য কিছুকাল পূর্ব্বে দেখা যাইত। তরঙ্গায়িতশীর্ষ (ঢেউ-খেলান) নাতিউচ্চ প্রাচীরে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত সুন্দর বৃক্ষাবলীসমাচ্ছন্ন এরূপ সুবৃহৎ আবাস-বাটী এ অঞ্চলে আর তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাগবাজারে স্বর্গীয় ভগবতী গাঙ্গুলীর

---

* উদ্বোধন—১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৭

বাটী বাস্তবিকই একটী দেখিবার জিনিষ ছিল। দু'-এক স্থলে প্রাচীরের নিম্নভাগের অংশবিশেষ ব্যতীত সেই নয়নাভিরাম প্রাসাদতুল্য ভবনের চিহ্নমাত্রও এখন আর নাই। বাটীখানির সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগে সুন্দর বাগান ছিল। ফুলফলের নানাবিধ বৃক্ষলতায় ও কয়েকটী পুষ্করিণীতে বাগানখানি শোভিত ছিল। বর্ত্তমানে সেই স্থান কয়েকখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী, দু'-একটী মাটকোঠা ও অসংখ্য খোলার ঘরে পরিপূর্ণ বস্তিতে পরিণত হইয়াছে।

গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয় মহাকুলীন 'বেগের গাঙ্গুলী' নামক প্রসিদ্ধ বংশোদ্ভব। শুনিতে পাই, বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাজা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কুটুম্বস্থানীয় ছিলেন বলিয়া এবং ঐ সূত্রে তাঁহাদের জমিদারীর কিয়দংশ কালে প্রাপ্ত হইয়াই গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। আমাদের আলোচ্য বিপিনবিহারী এই উচ্চকুলেই জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ওরফে 'নকুড় গাঙ্গুলী'। এখনও বাগবাজার পল্লীতে এমন কোন পুরাতন বাসিন্দা পরিবার বর্ত্তমান নাই, যাঁহারা এই খ্যাতনামা গঙ্গোপাধ্যায় বংশের সৌজন্য, অমায়িকতা, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণসমূহের সহিত পরিচিত নহেন। লোকে বলে 'মা লক্ষ্মী চঞ্চলা'। কিন্তু, তিনিই যথার্থ চঞ্চল-স্বভাবা হউন বা তাঁহার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল সেবকগণই তাঁহাকে চঞ্চলা করিয়া তুলুক, সময়ে সময়ে অনেককেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি চিরকালের নিমিত্ত হারাইতে হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এই সুপ্রসিদ্ধ পরিবারও কালে উহা হারাইয়াছিলেন। সে জন্য বিপিনবিহারী উচ্চ বংশোদ্ভব হইয়াও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তানের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষগণের অশেষ সমৃদ্ধির কোন অংশই তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ছাত্র-জীবন

বর্ত্তমান লেখকের সহিত বিপিনবিহারীর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানাইবার আবশ্যক করে না। তবে সাধারণভাবে তিনি আমাদের একজন পরম হিতৈষী, চরিত্রবান্, সমবয়স্ক, আদর্শ বন্ধু ছিলেন। বাল্যে বিপিন-বিহারীর সহিত আমাদের এক পল্লীবাসী বলিয়া পরিচয় ঘটে; কৈশোরে আমরা সহাধ্যায়ী; এবং যৌবনে সতীর্থ ও সহচররূপে আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। প্রথম দিন হইতেই সেই সরল, উদার, শান্ত ও অন্তরে-বাহিরে সুন্দর প্রকৃতি আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। কৈশোরে ও যৌবনে একত্র পাঠাভ্যাসে ও সদালাপে একসঙ্গে বহুকাল অতিবাহিত করায় সেই আকর্ষণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমাদের বেশ মনে পড়ে, যখন আমরা পূজ্যপাদ অধ্যাপক ও আচার্য্য শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'The New Indian School'এ অধ্যয়নে নিযুক্ত, তখন হইতেই বিপিনবিহারীর হৃদয়-সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া পরিচিত মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে। তখন আমরা চৌদ্দ বা পনের বৎসর বয়স্ক মাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য উভয়েই প্রস্তুত হইতেছিলাম। এক পল্লীতে বাস এবং এক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের জন্য আমরা উভয়ে এক স্থানে প্রায় সর্ব্বদা মেলামেশার বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম এবং নানাবিধ আলাপে যৌবনের আনন্দোজ্জ্বল দিবসগুলি আমাদের কত সুন্দরভাবে যে কাটিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। বিপিনবিহারীর অসামান্য সরলতা, উন্মুক্তহৃদয়তা ও বন্ধু-প্রীতি সর্ব্বদাই আমাদের উপভোগ্য ছিল। সেই সময়ে বৈকালে আরাম ও অবসর লাভেচ্ছায় আমরা প্রায়ই পূতসলিলা, কলিকাতা-পবিত্রকারিণী ভাগীরথীর তীরে সান্ধ্য-ভ্রমণে একত্র হইতাম ও কত রহস্য, কত সদালাপেই না সময়াতিপাত করিতাম! সন্ধ্যার পর

আবার স্থানীয় বালকগণের সাধারণ পাঠাগারে আমরা পুনরায় মিলিত হইয়া পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি একসঙ্গে পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম।

ধর্ম্মজীবন-সূচনা ও পুষ্টি

এইরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর আমাদের আনন্দে কাটিতেছিল। ঐ সময়ে একদিন আমরা রাস্তার দেয়ালে বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না ?' এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা 'ষ্টার থিয়েটারে'র রঙ্গমঞ্চে দিবেন। বিপিনবিহারী এই বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং শুনিতেও যাইলেন। আমাদের স্মরণ আছে ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম উন্মেষ। ভক্তপ্রবর ডাক্তার-মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একে একে অনেকগুলি বক্তৃতা নানা স্থানে প্রদান করেন। প্রায় সকল স্থানেই বিপিনবিহারী উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিসহকারে বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিলেন। ফলে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল ও তিনি কাঁকুড়গাছিস্থ রামবাবুর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-সমাধিমন্দির-শোভিত উদ্যানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় এইরূপে ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার পড়াশুনায় কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। কিন্তু পাঠাভ্যাসে বীতশ্রদ্ধ হইতে আমরা তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। তবে একই মন সমানুরাগে সমভাবে দুই দিকে চলিতে পারে না, সেই জন্যই আমরা পূর্ব্বোক্ত অনুমান করিতেছি। ইতিপূর্ব্ব হইতেই আমরাও দক্ষিণেশ্বরের পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সাধনেতিহাস ও তাঁহার প্রদত্ত মানবকল্যাণকর অমৃতময় উপদেশাবলী

কিছু কিছু শ্রবণ করিতেছিলাম। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই আমাদের পাড়ার ভক্তচূড়ামণি বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে প্রায় যাতায়াত করিতেন। ইঁহারা আমাদের ন্যায় অনেককেই ঐ সকল কথা শুনাইয়া মুগ্ধ ও উদ্দীপিত করিতেন। অতএব ঐ বিষয়েও বিপিনবিহারীর সহিত আমাদের ভাবের আদান-প্রদানের বেশ সুযোগ হইয়াছিল। বিপিন-বিহারী কাঁকুড়গাছি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক নূতন তথ্য আনিয়া আমাদের দিতেন; আর আমরাও বলরাম বসু-মহাশয়ের বাটীতে গমনাগমন করিয়া সাধুগণপ্রমুখাৎ অমৃতময়ী রামকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম। এই সকল আলোচনায় দু'-এক স্থলে আমাদের কখন কখন মতদ্বৈধও ঘটিত; কিন্তু তাহাতে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব, প্রীতি বা আনন্দের কখন অভাব হইত না। কি কারণে যে আমাদের মধ্যে ঐরূপ ভিন্ন মতের উদয় হইত, তাহাও আমরা তখন ঠিক ঠিক বুঝিতাম না। কিন্তু ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইল যে, কিছুকাল পরে বিপিনবিহারী স্বয়ংই স্বীয় মতের ভ্রমগুলি বুঝিতে পারিয়া পরিবর্ত্তন করেন এবং তত্তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রথমোপদেষ্টার মতসমূহও যে তিনি সব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। এ সকল কথার আবশ্যকতা ছিল না—তবে উত্থাপনের কারণ এই যে, আমাদের আলোচ্য বিপিনবিহারী হৃদয়ের ধন—তাঁহার ধর্ম্মমত বা বিশ্বাসসকল ভ্রমসঙ্কুল বুঝিতে পারিবামাত্র উহাদের অসমীচীন অংশসমূহ ত্যাগ করিয়া এই সময়ে যে অসামান্য সারল্য ও সত্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহাই পাঠককে বুঝাইবার প্রয়াস। এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সিকাগো (Chicago) সহরের বিরাট প্রদর্শনীস্থিত ধর্ম্ম-মহাসভায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত

করিয়া বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন। 'The Indian Mirror' নামক কলিকাতার খ্যাতনামা সংবাদপত্রে সে সময় আমরা প্রায়ই ঐ মহাত্মার অসাধারণ শক্তির পরিচয় ও আমেরিকায় অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভের বিষয় পাঠ করিয়া আনন্দিত হইতাম ও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতাম।

আমাদের পল্লীস্থ বলরামবাবুর বাটীতে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার কৃপাবারিস্পর্শে ও অমৃতময় উপদেশাবলী হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাগবাজার পল্লীর অনেকেই নূতনভাবে জীবন গঠনে তখন সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার সন্ন্যাসি-সেবকগণও বসুজ-মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত ভবনে প্রায়ই যাতায়াত ও কখন কখন অনেকদিন পর্য্যন্ত অবস্থানও করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র দর্শনলাভে পবিত্রীকৃত-জীবন পল্লীর পূর্ব্বোক্ত বয়োবৃদ্ধগণ এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী পল্লীর নূতন যুবকগণের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্ব হইতে তজ্জন্যই হইয়াছিল। বৃদ্ধদিগের ভিতর অনেকে পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথের এই অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয়-কথা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখেই শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সেই লোকোত্তর পুরুষের উল্লিখিত কথাগুলি এইরূপে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের জীবনে সফল হইতেছে দেখিয়া মহানন্দানুভব করত মনোযোগ সহকারে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্বামীজির উপর বিপিনবিহারীর ভক্তি-অনুরাগও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে তিন-চারি বৎসর কাটিয়া গেল। আমাদের জীবনেও অনেক বিপর্য্যয় ঘটিল। কেহ কেহ তখনও পাঠে নিযুক্ত, আবার কেহ কেহ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুবিখ্যাত বেলুড় মঠের

প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে পিপাসুগণের ধর্ম্মতৃষ্ণা মিটাইতে অনন্যমনে সাহায্য করিতেছিলেন। বাগবাজারে উক্ত বন্ধু-মহাশয়ের ভবনে পূজ্যপাদ স্বামীজি 'রামকৃষ্ণ-মিশন' নামে একটী ধর্ম্ম-সভার প্রতিষ্ঠা করায় কলিকাতার বহু ব্যক্তির বিশেষ সাহায্য হইতেছিল। দলে দলে যুবকগণ আসিয়া এই মহামনীষীর চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছিলেন। আমাদের মধ্যেও অনেকেই এই শুভ মুহূর্ত্তে আপন আপন জীবন নূতন পথে চালিত করিতে সমর্থ হইলেন। বিপিনবিহারীর ধর্ম্মজীবনও এই মহাসুযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-আলোকে সম্যক্ বিকশিত হইয়া উঠিল। প্রাতের শিশিরসিক্ত ফুল্লোজ্জ্বল কুসুমের ন্যায় তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্র ও ঈশ্বরানুরাগ এখন হইতে তাঁহাকে সকলের আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিল। এই সময় হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে শান্ত-স্বভাব, মিষ্টভাষী, সদালাপী সরল ও ধর্ম্মচিন্তাপরায়ণ যুবক বলিয়া চিনিলেন ও হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রীতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

সাধারণ ও বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে

ইতঃপূর্ব্বে বিপিনবিহারী Messrs. John Dickinsonএর অফিসে চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার অফিসের বন্ধুগণের অনেকেই তাঁহার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এ-দিকে পল্লীবাসিগণও সেই মত—আবার বন্ধুবান্ধবগণও সতীর্থ। সকল দিকেই বিপিনবিহারীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবনালোচনার সমান সুযোগ। অফিসের কার্য্যাবকাশে বেলুড় মঠে ও কাঁকুড়গাছিতে যাতায়াত, তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে একে একে

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিয়া রামকৃষ্ণ-লোকে গমন করিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কার্য্যাদিতে যোগদান করিয়া ধন্য হওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কার্য্যের যথাসাধ্য সাহায্য করা বিপিনবাবুর জীবনেরও একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল।

পূজ্যপাদ স্বামীজির দেহত্যাগের পর 'বিবেকানন্দ-সোসাইটী' নামে এক সভা কলিকাতার স্কুল-কলেজ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইল। উদ্দেশ্য,—স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র আদর্শে সভ্যগণের জীবন-গঠন-চেষ্টা ও ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে এই মহানুভবের অমূল্য চিন্তারাশি বিস্তৃত ও সমাদৃত হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা। এই সভার কার্য্যে বিপিনবিহারী প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং উহার পরিরক্ষণে একটী স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এই সভা কর্ত্তৃক একটী ছাত্রাবাস (Boarding) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সভার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে বেশ সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে ও নানা কারণে ছাত্রাবাস পরিচালনে সভা অক্ষম হইলেন। সাধারণের, বিশেষতঃ ছাত্রগণের জন্য ধর্ম্মবিষয়ের নানা আলোচনার আয়োজন করিয়াই অতঃপর সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। বেলুড়-মঠের পবিত্রাত্মা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অনেকে উহাতে যোগদান করিয়া নানা সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দান ও কথোপকথন ক্লাসে উপস্থিত জিজ্ঞাসুগণের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে তৃপ্ত করিতেন। এই সভার কয়েকটী বিশেষ অধিবেশনে সভার কয়েকজন সভ্যও সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠ করেন। বিপিনবিহারী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কখনও প্রকাশ্যভাবে সাহিত্য-সেবা করেন নাই—কেবলমাত্র অবকাশকালে প্রতিনিয়ত স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন—এবং সাধারণ্যে যাহাতে এই সকল মহামূল্য চিন্তারাশির প্রচার ও প্রসার হয়, তজ্জন্য লালায়িত ছিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় এখন তিনি অদম্য উৎসাহে কয়েকটী

মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণ্যে পাঠ করেন। গত দুই বৎসরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ-পরিচালিত 'উদ্বোধন' পত্রে তাঁহার রচিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা, ১ম—"আমাদের জাতীয়তা" ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২য়—"দেশ-হিতৈষণা" (১ম প্রস্তাব) ১০ম বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, ৩য়—ঐ (২য় প্রস্তাব) ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪র্থ—"আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার" ১১শ বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা। এই সকল প্রবন্ধ পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, বিপিনবিহারীর প্রতিভা বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমায় নাই। কালে তিনি সারস্বত-সেবায় যে সম্পূর্ণ সফল-মনোরথ হইতেন, ইহাও প্রতীয়মান হয়।

অপর দিকে আবার ধর্ম্ম-প্রাণ বিপিনবিহারী নিভৃত সাধন-ভজনের অনুরাগী হইয়া ইত্যবসরে গোপনে বেলুড়-মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র, ধর্ম্মৈকপ্রাণ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি, এই মহাপুরুষের আশ্রয়ে ও সাহায্যে তাঁহার বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার চিত্ত আধ্যাত্মিক আলোকে দিন দিন অধিকতর স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া ধর্ম্মজগতের গূঢ় সত্য সকল অনুভব ও ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গতপূর্ব্ব বৎসর কলিকাতায় যে বিরাট ধর্ম্ম-সঙ্ঘের (Convention of Religions) অনুষ্ঠান হয়, বিপিনবিহারী তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা। রামকৃষ্ণ-মিশন ও বিবেকানন্দ-সোসাইটীর উদ্যমে যে সকল লোকহিতকর কার্য্য শহরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হইত, বিপিনবিহারী উহাদের প্রায় সকলগুলিতেই উপস্থিত হইয়া তাহাদের সুষ্ঠু সমাধানকল্পে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করিতেন। এক কথায়, বিপিনবিহারী গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় সৎকার্য্যানুরাগী, স্বার্থত্যাগী ও পরিশ্রমী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নাট্যকলানুরাগ

বিপিনবাবুর যতটুকু চিত্র আমরা প্রদানে সমর্থ হইলাম, তাহাতে সকলে ইহাই কেবল বুঝিবেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ-সেবকগণের মধ্যে একজন চরিত্রবান, অধ্যবসায়শীল, পরহিতচিকীর্ষু ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম-চিন্তাই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইলেও তাঁহার মনে আরও দু'-একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেগুলিতেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সে-সকল কথার উত্থাপন না করিলে তাঁহার জীবনের পূর্ণাবয়ব চিত্র পাঠকের মনে অঙ্কিত হইবে না—এজন্য সেই সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইলাম। বঙ্গদেশে স্থায়ী নাট্যকলা-চর্চ্চার এক প্রকার জন্মভূমি বলিয়া কলিকাতার বাগবাজার পল্লীকে অনেকে গণনা করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালা-সমূহের ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে, কথাটা অনেকটা ঠিক। এই পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও প্রতিবাসী বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নটকবি নাট্যকলা-বিশারদ আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার অনুরাগী হইয়া অবসরকালে বিপিনবিহারী সৎ নাটকাদি পাঠে ও তাহাদের অভিনয় দর্শনে কিছু কিছু সময় ব্যয় করিতেন। ইহার ফলে, তাঁহার মন অভিনয়-কলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় ও চরিত্রবান থাকিয়া উৎকৃষ্ট অভিনেতা হওয়া একটা আনন্দের বিষয় বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ক্রমে অভিনয়-কলার অনুরাগী হইয়া পড়েন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জানুয়ারী ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী 'The Calcutta University Institute' নামক সভার তরুণ সভাগণ যখন প্রথম বাঙ্গালা নাটকাভিনয় করেন, তখন আমরা উভয়ে তাহাতে ব্রতী হইয়াছিলাম। আজীবন-সহচর বিপিনবাবুর উল্লিখিত অনুরাগের পরিচয় পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু

পাইয়াই আমরা তাঁহাকে ঐ দলভুক্ত করিয়া লই। অমর কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' (নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত) এ-ক্ষেত্রে অভিনীত হয়। তাহাতে বন্ধুবর একটী ভূমিকা সানন্দে গ্রহণ করেন। ভূমিকাটী স্ত্রীলোকের। কিন্তু অনেক পুরুষ-ভূমিকা অপেক্ষা সে ভূমিকার অভিনয় কঠিন। 'নৃমুণ্ডমালিনী'র বিচিত্র ভূমিকা বিপিনবাবু এ-ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত অভিনয় করেন। একই দৃশ্যে আমরা দুইজনে কথোপকথনচ্ছলে অভিনয় করি। কিন্তু, বন্ধু প্রীতিতেই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, তাঁহার অভিনয় ও আবৃত্তি আমার সুন্দর লাগিয়াছিল। এই অভিনয়স্থলে বহু স্কুল-কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী, বঙ্গের বাণী ও রমার বহু বরেণ্য সন্তান, এমন কি বঙ্গের মহামান্য শাসনকর্ত্তা Sir John Woodburn বাহাদুরও পারিষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ই বিপিনবাবুর এই বিষয়ের প্রথম উদ্যম।

দ্বিতীয়বারেও আমরা একত্রে নাট্যাভিনয়ে ব্রতী ছিলাম। প্রথম-বারের ন্যায় এই অভিনয়ও বহু সম্মানার্হ-বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে সম্পন্ন হয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে (২৪এ বৈশাখ ১৩০৭) আমরা কবিবর নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের অংশবিশেষ নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করি। ইহাতে বন্ধুবর 'অভিমন্যু'র শ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিনয় অতীব হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। বঙ্গের প্রথিতনামা 'সোমপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক-পত্র এই অভিনয়ের অন্যান্য ভূমিকার প্রশংসাবাদের পর এইরূপ লিখিয়াছিল। 'কৃষ্ণ ও অভিমন্যু' তাঁহাদের স্ব স্ব অংশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। * * *

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মহামান্য জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক লোক অভিনয় দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।" (কৃষ্ণের ভূমিকা বাগবাজার পল্লীর সুপরিচিত আমাদের প্রিয় যুবক-বন্ধু

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, গ্রহণ করিয়াছিলেন) অভিনয় নিশ্চিতই সুন্দর হইয়াছিল। তাহা না হইলে সে ঝড়বৃষ্টির মহাদুর্য্যোগে বাণীর ঐ সকল খ্যাতনামা বরপুত্র আমাদের ক্ষুদ্র অভিনয় দর্শনের জন্য তাঁহাদের মহামূল্য সময় অতটা অতিবাহিত করিতেন না।

তৃতীয়বারে ঐ সাহিত্য পরিষদেরই নবম বার্ষিক অধিবেশনে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে আমরা বিপিনবাবুকে 'Model Recitation Club' নামক সম্প্রদায় ভুক্ত দেখি এবং তাঁহাদের অভিনীত মহিলাকবি শ্রীমতী কামিনী রায় মহাশয়ার 'একলব্য' নাটকের 'দ্রোণাচার্য্য'-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই। সম্প্রদায়স্থ অন্যান্য অভিনেতৃগণ অপেক্ষা এক্ষেত্রে তাঁহার অভিনয়ই ভাল হইয়াছিল। শুনিতে পাই, বিপিনবাবু শিকদার বাগানের কোনও ক্লাবের সংশ্রবে 'সংসার' নাটকের 'প্রিয়নাথ' ও 'প্রফুল্ল' নাটকের 'মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া' নামক ভূমিকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া অভিনয় করেন। এই দুইটী ভূমিকা অভিনয় দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এজন্য বন্ধুবরের এই দুইটি অভিনয় সম্বন্ধে আমরা মতামত প্রকাশে অক্ষম।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা এ-দিককার কথা শেষ করিব। দুই বৎসর হইল, বাগবাজার পল্লীতে 'সোসিয়াল ইউনিয়ন' নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে পল্লীস্থ যুবকগণ মিলিত হইয়া অবকাশকাল সদালোচনায় অতিবাহিত করিবার জন্য বিশুদ্ধভাবের সঙ্গীতাদি, বিশেষতঃ, নাটকাভিনয়ের চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য বিজ্ঞ সাহিত্য ও নাট্যরথিগণ এই সভার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উপদেষ্টাভাবে যোগদান করিয়াছেন। গত ১৯০৯ খৃঃ ২২এ আগষ্ট এই সভা কর্ত্তৃক 'মেঘনাদ-বধ' নাটকাভিনয় হয়। বিপিনবাবু এই সভার অভিনেতৃগণের অগ্রণী হইয়া নাম-ভূমিকা মেঘনাদের অভিনয় করেন। পরে ৭ই নভেম্বর (১৯০৯) ঐ সভার বার্ষিক অধিবেশনের 'বুদ্ধদেব চরিত'-নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হইয়াছিল।

এই তুই অভিনয়েও তিনি স্থানীয় সমবেত শিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধ-যুবকগণের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন করেন। বিপিনবাবুর এই সকল অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কালে তিনি একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইতে পারিতেন। এই সকল অভিনয় ব্যতীত তিনি বেলুড়-মঠের নানা সভার অধিবেশনে বহু উৎকৃষ্ট কবিতার সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি শুনাইয়া অনেককে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। নিজলিখিত প্রবন্ধসমূহ এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রবন্ধাবলী পাঠকালীন তাঁহার আবৃত্তি অতীব শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইত। যাঁহাদের এই সকল আবৃত্তি শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের কর্ণে এখনও সেই মধুস্রাবী মর্ম্মস্পর্শী স্বর ধ্বনিত হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মারুণরাগরঞ্জিত-মুখমণ্ডল ও তপ্তচামীকরশুদ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে এখনও সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে।

স্বদেশ-প্রীতি

আর একটী বিষয়ের উজ্জ্বল অনুরাগ আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি; উহা বিপিনবাবুর স্বদেশানুরাগ। তিনি সর্ব্বদাই স্বদেশের ও স্বজাতির হিত চিন্তা করিতেন; দেশের ও দশের কোনও অকল্যাণ দেখিলে বিশেষ তুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইতেন। কিন্তু তা' বলিয়া তিনি বর্ত্তমান কালের স্বদেশী কোনও দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, এবং রীতিমত বিচার, চিন্তা ও গবেষণা না করিয়া কোন মত বা ভাব গ্রহণ করিতেন না। ঐ বিষয়ের বহু আলোচনা ও অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি কখনও কোনও সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া কার্য্যে ব্রতী হয়েন নাই। কখন কখন রাজনীতি আলোচনার কিছু কিছু ঝোঁকও তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি; কিন্তু পরে তিনি

ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে,—ভারতের জাতীয় মেরুদণ্ড ধর্ম্ম ; এ-দেশে ধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। সেই জন্য গভীর চিন্তা-সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দ অল্প কথায় যে সকল মহাসত্য দেশের হিতের জন্য প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ভিতর হইতে কোন কোন কথা লইয়া উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর অধিবেশনের জন্য প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন এবং সাধারণে যাহাতে ঐ সকল সত্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং ঐ ভাবে জীবন গঠন করিয়া ধন্য হয়েন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলির নাম আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলিতে তাহার ধর্ম্মানুরাগ, দেশানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ তিনেরই এক কালে পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর উপরোক্ত বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি 'সামাজিক সম্মিলনীর আবশ্যকতা' নামক এক সুন্দর মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতেও দেশের ও দশের অনেক হিত-কথা ছিল।

মানুষ-হিসাবে

আমরা এ যাবৎ যাহা কিছু বলিলাম, তাহাতে বিপিনবাবুর বিশেষ বিশেষ গুণের কথারই আলোচনা হইল। এক্ষণে সাধারণভাবে তাঁহার বিষয়ে দু'-দশটী কথা বলা আবশ্যক। তাঁহার সহিত যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, সে-রূপ সদানন্দময়, সহাস্যবদন, সরলান্তঃকরণ, মিষ্টভাষী, সদালাপী, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, বালক-স্বভাব ও চরিত্রবান ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। কোন একটী বিশেষ গুণের আধারই সাধারণতঃ সংসারে নয়ন গোচর হয়, কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ বহুগুণাধার

পুরুষ সাধারণে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা বহুবর্ষব্যাপী প্রগাঢ় সখ্যতায় তাঁহার সহিত আবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনও কাহারও প্রতি রুষ্ট হইতে দেখি নাই বা শুনি নাই। বলিতে কি, এবং বলিলেও সকলে বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না, বিপিনবিহারীর মিত্র ব্যতীত শত্রু কেহ ছিল না। কারণ তিনি সকলেরই দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণভাগ মাত্র গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিক এমন গুণগ্রাহী ব্যক্তি সংসারে যথার্থই দুর্ল্লভ। বিপদগামী বিপন্ন বন্ধুর জন্য তাঁহার ন্যায় সহৃদয়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আমরা অল্প লোককেই দেখিয়াছি। লোভ-মোহাদির প্রলোভনে পদস্খলিত হইলে সংসারে আত্মীয়গণ বিরোধী হয়, কিন্তু বিপিনবাবুর উন্নত হৃদয় সেই সময়েও সেই হতভাগ্য পুরুষের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া তাহার মঙ্গল চিন্তাতেই মগ্ন থাকিত। তিনি কখনও কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই—এ-কথা বেশ বলা যায়।

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়

বিপিনবাবুর আর একটী গুণ তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং তদ্বিষয়ে অধ্যবসায়। সাধারণের ন্যায় অফিসের কার্য্যাদি কোনরূপে গোলমেলে সম্পন্ন করিয়া বাটী ফিরিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেন না। ঠিক ঠিক ভাবে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তজ্জন্য কর্ম্মচারী হিসাবেও অফিসে তাঁহার সুনাম ছিল ও উত্তরোত্তর উচ্চপদ লাভ হইতেছিল। অবকাশ পাইলেই বাটী আসিয়া তিনি তাস দাবায় মত্ত হইতেন না। অধিকন্তু অফিসের 'হাড়ভাঙ্গা খাটুনি' খাটিয়া নির্গত হইয়াই প্রত্যহ তিনি বেলুড়-মঠ বা বিবেকানন্দ-সোসাইটীর কোনও না কোন কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন এবং শরীরপাত পণ করিয়া ঐ সকলের সাফল্যের দিকে

প্রযত্ন করিতেন। আবার কখন কখন কোন কার্য্যাদির ভার স্কন্ধে না থাকিলে বাটীতে আসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ ও সৎনাটকাদি পাঠ ও উহাদের সুন্দর সুন্দর অংশগুলির আবৃত্তির অভ্যাস করিতেন; অথবা সুচরিত্র, কাব্যানুরাগী যুবকগণ প্রতিষ্ঠিত নাট্য-সম্প্রদায়ে যোগদান করিতেন; কিংবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর ও শিষ্য সন্ন্যাসিব্রহ্মচারিগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সদালোচনায় নিজ জীবনের উন্নতি সাধন করিতেন। তাই কখনও তাঁহাকে আমরা বৃথা কালক্ষেপ করিতে দেখি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তাগ্রণী সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটে বিনীত ছাত্রের ন্যায় বসিয়া কখন কখন তাঁহাকে বহুক্ষণ-ব্যাপী কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিতেও আমরা দেখিয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ ঘোষজ-মহাশয় তাঁহাকে পুত্রোপম স্নেহে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ও সদ্বিষয়ে তীব্রানুরাগ দেখিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেন!

অকাল-প্রয়াণ

সুহৃদ্বর বিপিনবিহারী বহুগুণে আবালবৃদ্ধের চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং কালে আমাদের দেশের ও সমাজের তিনি যে একজন পরম ভরসার স্থল হইবেন, তদ্বিষয়ে সকলের হৃদয়েই আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল মুকুল বিকশিত হইয়াই প্রখর রবি-তাপে ঝলসিয়া গেল! আমাদের ভাগ্যে উহার মনোজ্ঞ সৌরভমাত্রই উপভোগ্য হইল—রসনা-তৃপ্তিকর ফলের আস্বাদে প্রাণের ক্ষুধা শান্ত করিবার অবসর আর ঘটিয়া উঠিল না! এমন সর্ব্বলোকপ্রিয় বন্ধুবর অকালে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন!

বিপিনবিহারীর স্বাস্থ্য কখনও মন্দ ছিল না। দু'-একবার সামান্য

সামান্য অসুখ হইয়াছিল মাত্র। সে কমনীয় অথচ বলিষ্ঠ দেহ দর্শনে কাহারই বা মনে হইত যে, তিনি এত অল্পকাল মধ্যে আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া চিরকালের জন্য আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইবেন। সর্ব্বদা হাস্যবদন, সদালাপী, বন্ধুবৎসল, পরদুঃখকাতর বিপিনবিহারীর প্রেম-জ্ঞান-বিস্ফারিত বিশাল নয়নযুগল ও সুন্দর সুদৃঢ় শরীর দেখিয়া সকলের অনন্ত জীবনের কথাই মনে উদিত হইত। মৃত্যুর করাল ছায়া যে তাঁহার এত নিকটে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, এ-কথা কাহারও মনে কখনও আসে নাই। আমাদের সকল আশা উন্মূলিত করিয়া বিপরীত সংঘটন কেন হইল, কে তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? দয়া-ধর্ম্মের স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল কাম-কাঞ্চনকীটদষ্ট সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ এ-রূপ দেবভোগ্য পবিত্র হৃদয় অধিকদিন সংসারে থাকিলে পাছে কলুষিত ও আবিল হয়, এই জন্যই কি শ্রীভগবান তাঁহাকে সাদরাহ্বানে নিজ সমীপে ডাকিয়া লইয়া অনন্তকালের মত শ্রীচরণ-তলে স্থান দিলেন! আর এ-পৃথিবীর হতভাগ্য আমরা, সে সুন্দর রত্ন হারাইবার পর এ পাপ-পঙ্কিল সংসারে উহার কত মূল্য বুঝিতে পারিয়া বিরহ-ব্যথিত-চিত্তে, ছলছল নেত্রে—আবার যদি তাঁহার দর্শন পাই তবে যথাযথ যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইব ভাবিয়া—এ-দিক্ ও-দিক্ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি!

বিপিনবিহারী সংসারী হইয়াও সংযমী ছিলেন। একটী কন্যা ও একটী মাত্র পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার পর হইতেই তিনি দেবী-সদৃশী রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বগুণভূষিতা স্ত্রীর সহিত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে যে রত ছিলেন, এ-কথা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি। সংসারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের বন্দোবস্তমাত্র করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন। অপর সাধারণের ন্যায় পার্থিব নানা সুখ-ভোগের কামনা রাখিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর তিন-চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার

পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতার জীবিতকালে পিতাই একমাত্র সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে বিপিনবিহারী তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবী ও অনুজ সহোদরের উপরেই সংসারের সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই বিপিনবিহারী এক মর্ম্মন্তুদ মহাশোক প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার একটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে বালক পুত্রটিকে অকস্মাৎ হারাইয়া তিনি মর্ম্মাহত হয়েন, এবং এই শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন অতি শীঘ্রই নিজ ইষ্টদেবের শ্রীচরণপ্রান্তে স্বয়ং আশ্রয় লইলেন। গত সোমবার, ২০এ আষাঢ়, ১৩১৭ সাল (৪ঠা জুলাই, ১৯১০ খৃঃ) টাইফয়েড (বাতশ্লেষ্মা বিকারোত্থ) নামক দারুণ রোগে আট দিন মাত্র ভুগিয়াই চৌত্রিশ বৎসর বয়সে বিপিনবিহারীর সোনার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল! স্বপ্নেও যাহা কখনও ভাবিতে পারি নাই, তাহাই সংঘটিত হইল।

আক্ষেপ ও প্রার্থনা

সুহৃদ্বর, এ হাহাকারদীর্ণ পাপপঙ্কিলতাপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুমি চিরশান্তির অধিকারী হইলে, কিন্তু তোমার পরমারাধ্যা শোকলুণ্ঠিতা দুঃখিনী মাতা, বিয়োগ-বিধুরা দগ্ধহৃদয়া সহধর্ম্মিণী, সুখলালিতা বালিকা কন্যা, শোকাকুল ভ্রাতা, সন্তপ্তা সহোদরা, বিচলিতহৃদয় অশীতিপর-বৃদ্ধ পূজনীয় খুল্লপিতামহ ও বিরহ-কাতর বন্ধু-বান্ধবগণকে কি বলিয়া কে সান্ত্বনা দিবে, তাহা ভাবিয়া পাই না! ঐ দেখ ভাই, তোমার অদর্শনে সন্ন্যাসী ও গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ, 'বিবেকানন্দ-সোসাইটি'র বন্ধুগণ, 'বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়ন'এর সভ্যগণ ও তোমার শোককাতর পরিবারবর্গ কিরূপ ব্যথিত হইয়া রহিয়াছেন! ভাই, তুমি ত সংসারের

মায়া-মোহে অপর সাধারণের ন্যায় লিপ্ত না থাকিলেও যথার্থই প্রেমিক ছিলে। সে প্রেমে আজ আমাদের বঞ্চিত করিও না! স্বর্গে তোমার আরাধ্য সমীপে প্রার্থনা করিয়া তোমার পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী ও বিরহকাতর অন্যান্য সকলের হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দাও! আর প্রফুল্লমুখে আমাদের আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমারই ন্যায় সুন্দর প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া আপামর সাধারণের কল্যাণ-চিন্তায় দেহপাত করিতে পারি! তুমি যেমন নিভৃতে, নীরবে, পার্থিব নামযশে উদাসীন থাকিয়া নিষ্কলঙ্ক উন্নত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছ, আমরাও যেন নিজ নিজ জীবনের শেষ কয়টা দিন সেই ভাবে যাপন করিয়া তোমারই ন্যায়, আমাদের উভয়ের আরাধ্যদেবের শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় চির-শান্তির অধিকারী হইতে পারি!

ওঁ শান্তি! হরি ওঁ!

*   *   *   *   *   *

"Farewell, Dear Brother, Thou wert one of
'God's own kin',
Thy home of peace and rest thou now hast
entered in!"

(J. C. Wyman)

বিবেকানন্দ-জননী *

"Lives of great men all reminds us,
We can make our lives sublime"
*   *   *   (Longfellow.)

বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, বাঙ্গালীর শিরোমণি, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয়তম শিষ্য, জগদ্‌বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয়-কথা বোধ হয় 'প্রতিবাসী'র পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট অজ্ঞাত নহে। সেই পূজ্যপাদ স্বামীজির পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী গত মঙ্গলবার, ৯ই শ্রাবণ, বেলা ৫টার সময় ইহসংসার ত্যাগ করিয়া করুণাময়ের আনন্দধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

'তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর
নির্ম্মল গগন-বিলাসী!
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল,
বিভোর বাল-সন্ন্যাসী।'

মহাকবির লেখনী-মুখে মহাপুরুষের জন্ম-কথা প্রাণস্পর্শিনী কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গনারীকুলোজ্জ্বলা দেবীসদৃশী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর জীবনালোচনা বঙ্গবাসীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা সংক্ষেপে সেই পরম শ্রদ্ধেয়া মহিমময়ী দেবীর কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিতেছি। মহাপুরুষগণের জননীরা যে নানা সদ্‌গুণভূষিতা হয়েন এ-কথা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না। সিদ্ধকবি গাহিয়াছেন,—

* প্রতিবাসী—১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৮

'মাতার প্রকৃতি যাহা, সুত স্বতঃ পায় তাহা,
জননীর দোষ গুণ কিছু না এড়ায় !'

মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের গর্ভধারিণী যে বহুগুণান্বিতা ছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। পূজ্যপাদ স্বামীজির পিতৃদেব সিমুলিয়া-নিবাসী হাইকোর্টের তাৎকালীন সুবিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তিনি কয়েকটী কন্যা ও তিনটী পুত্র রাখিয়া যান। শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীই ইঁহাদের লালনপালন করিয়াছিলেন। অসহায়া হিন্দু বিধবার পক্ষে বর্ত্তমানকালে কয়েকটী অপোগণ্ড বালক-বালিকাকে মানুষ করিয়া তোলা যে কতদূর কঠিন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে ধারণা করিতে পারে না। মাতৃদেবীর নানা সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ যে কিরূপ 'মানুষ' হইয়াছিলেন, তাহা জগজ্জনবিদিত। জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকনন্দ ঔদার্য্যের গুণে জীব-সেবা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেবা-ধর্ম্ম পালনের যে সকল ব্রতানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গুণ যে তিনি বহু পরিমাণে তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট হইতেই পাইয়াছেন, তাহা বিবেকানন্দ-জননীর চরিতকথা-বিদিতজনমাত্রেরই জানা আছে। বিগত আষাঢ় মাসে (১৩১৮ সন) মহাসৌভাগ্যফলে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে একত্র বাসকালে বর্ত্তমান লেখক তাহার প্রভূত পরিচয় পাইয়াছে। পরিচিত অপরিচিতের উপর সমান দয়া, আর্ত্ত বিপদগ্রস্তের শোকে অসীম সহানুভূতি, সর্ব্বদাই পরশুভেচ্ছা প্রকাশ, সাধ্যমত স্বার্থত্যাগ ও পরদুঃখমোচনানুষ্ঠানে রত হওয়া প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে যে তিনি ভূষিতা ছিলেন, তাহা যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে সামান্যকালের জন্যও আসিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন। অমন সরলা, মিষ্টভাষিণী, অমায়িকা, দয়াবতী ও নিরভিমানা মহিলা এ-যুগে অল্পই দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের ধারণা। স্বামী-বিয়োগের পর হইতেই ইনি পরম পবিত্রা ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া আসিতে

ছিলেন। সত্যানুরাগিণী, স্বধর্ম্মরতা হইয়া তিনি হিন্দু বিধবার আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। শরীর পাত করিয়াও পরসেবা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। বারাণসীস্থ বীরেশ্বর মহাদেবের উদ্দেশে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া বীরেশ্বর-দেহধারী মহাধর্ম্মবীর বিবেকানন্দকে সন্তানরূপে তিনি পান। নরেন্দ্রনাথের অপর নাম সেই জন্য 'বীরেশ্বর।'

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করেন ও তাঁহার মহাগুরু-প্রদত্ত মহারত্ন 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়'-বার্ত্তা অতি অল্পকাল মধ্যেই সসাগরা পৃথিবীতে বিঘোষিত করিয়া ইহসংসার ত্যাগ করেন; কিন্তু মহীয়সী রত্নগর্ভা বিবেকানন্দ-জননী রত্নহারা হইয়াও আজ জগৎপূজ্যা ছিলেন। সুদূর মার্কিন ও ইংলণ্ডবাসী নরনারীবৃন্দও আজ স্বামীজির মাতার চরণে অর্ঘ্য দান করিতেছে। আসুন "প্রতিবাসীর" পাঠক-পাঠিকাগণ, আসুন সকলে মিলিয়া আজ এই মহামহিমান্বিতার শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া আমরা কৃতার্থ হই। আর তাঁহার শোকসন্তপ্ত সুত-সুতার * এই গভীর শোকে অন্তরের সমবেদনা আমরা জানাই। কেন না—'Sorrow ceases when shared with five!' 'ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ'। আসুন সকলে মিলিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—যে ভুবনোজ্জ্বলা ভুবনেশ্বরীর ন্যায় বঙ্গ-জননী যেন আমরা আবার পাই। বঙ্গ-জননীগণ যেন আবার স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় দেশমান্য, জগৎপূজ্য ধর্ম্মবীরের প্রসূতি হয়েন।

* উপস্থিত স্বামীজির দুই ভ্রাতা ও এক ভগিনী বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি ইউরোপ ও এসিয়ার নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। স্বামীজির আদর্শ গ্রহণ করিয়া ইনি বহুদেশ পদব্রজেই ভ্রমণ করেন। ইনি পণ্ডিত ও সুধী বলিয়া অনেকের নিকট সমাদৃত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তর' পত্রের প্রথম সম্পাদক বলিয়া সমাজে পরিচিত। স্বামীজির ভগিনী সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষ মহাশয়ের পত্নী। ইনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা।

সিষ্টার নিবেদিতা *

-:*:-

মহাপ্রস্থান

'ওখানে গগনে কাল ছিল এক তারা,
কে জানে কেমনে আজ কোথা' হ'ল হারা !
বারিধি-বিপুল-কূলে বালুকা বিস্তার,
কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার !'

(সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

আজ কয়েক মাস ধরিয়া আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে নানা আধিদৈবিক উৎপাত ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইতেছে। বঙ্গের সাহিত্যাকাশ হইতে পর পর 'ইন্দ্র' 'চন্দ্র' পাত হইতেছে। নানা ভাষার বিশ্বকোষ, মহামনীষাসম্পন্ন হরিনাথ দে অকালে লোকান্তরিত হইলেন। কিছু দিন না গত হইতে হইতেই পুনরায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য বঙ্গের বেদান্তাধ্যাপক ও প্রচারক কালীবর বেদান্তবাগীশ পরলোক যাত্রা করিলেন। বঙ্গীয় রাজন্য-বর্গের অন্যতম খ্যাতনামা কুচবিহারাধিপতি ও উত্তরপাড়ার কুমার রাজেন্দ্র-নাথ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। চিকিৎসককুলভূষণ কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন আমাদের ত্যাগ করিলেন। আবার সে-দিন তারা মা'র সুসন্তান তারা-পীঠের সেই অত্যদ্ভুত বামা ক্ষেপা

* উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

তারাপদে প্রয়াণ করিতে না করিতেই ভক্তশিরোমণি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রামকৃষ্ণ-লোকে গমন করিলেন। জগতে সকলে আক্ষেপ করে—যেমনটী যায়, তেমনটী আর হয় না!—যাহা হারাই, তাহা আর পাই না! এ কথা সম্পূর্ণ-রূপে না হউক, বহুপরিমাণে সত্য। কারণ, কে বলিবে বঙ্গমাতার পূর্ব্বোক্ত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণের ন্যায় মহাত্মগণকে পাইয়া আবার কবে আমরা গৌরবান্বিত হইব? কিন্তু হায়! বঙ্গাকাশে এ দুর্ভাগ্য রজনীর এবার কি আর অবসান নাই? পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণের স্থান কালে পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু যে মহোজ্জ্বল রত্ন আমরা আজ (১৩।১০।১৯১১) হারাইয়াছি, তাহার স্থান কি আর কখন পূর্ণ হইবে? বহু সৌভাগ্যের ফলে উদিত হইয়া যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুকতারা গত চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া কান্তমধুর দীপ্তি দান করিয়া বাঙ্গালীর মনে বহুতর আশা-বাণী জাগাইতে জাগাইতে আজ অকস্মাৎ অস্তমিত হইল, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কখন কোন কালে যে তাহার অনুরূপ আর একটী দেখিতে পাইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, ইনি বঙ্গে জন্মগ্রহণ না করিলেও যথার্থই বাঙ্গালী ছিলেন—ভারতে শরীর-পরিগ্রহ না করিলেও ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্ব্বোপরি ভারত-প্রেমে আমাদের অপেক্ষাও ভারতের নিজস্ব হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী হারাইয়া হয়ত আবার তাদৃশগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী পাইব, ভারতবাসী হারাইয়া হয়ত কালে আবার কোনও দিন তদনুরূপ ভারত-বাসী পাইব, কিন্তু ভারতেতর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এমন ভারত-প্রেমিকা, বঙ্গীয়রমণীকুলসম্ভূতা না হইয়াও এমন বাঙ্গালীর সমবেদনা-ভাগিনী ও আদর্শ হিন্দু-রমণীর ন্যায় এমন বঙ্গাঙ্গনচারিণী, লোকহিত-ব্রতধারিণী, ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতার ন্যায় ভগিনী আর আমরা কখনও পাইব না! বিদেশী হইয়াও ভারত এবং বঙ্গের হিতৈষী উন্নতমনা পুরুষ ও মহীয়সী মহিলা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক পাইয়াছি, কিন্তু বিদেশ হইতে

বহু যত্নে সমাহৃত ও শ্রীভগবানের মহাপূজায় সম্যকরূপে নিবেদিত হইয়া ভারতপ্রেমে এমন পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত প্রফুল্ল পারিজাত-সদৃশ স্নিগ্ধকোমল জীবনকে ভারতের নিজস্ব বলিতে আমাদের সৌভাগ্যে আর কখন ঘটিবে কি না, সন্দেহ-স্থল।

সংক্ষিপ্ত-পরিচয় ও আত্ম-নিয়োগ

সিষ্টার নিবেদিতার ন্যায় বিদুষী, হৃদয়বতী মহিলা অনুসন্ধানে অতি অল্প-সংখ্যকই এ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'মিস্ মারগারেট্ নোব্‌লে'র পিতা স্কটল্যাণ্ড-নিবাসী এবং মাতা আয়র্ল্যাণ্ড-নিবাসিনী ছিলেন। ইনি লণ্ডনে শিক্ষালাভ করিয়া স্বল্পকালেই সুপণ্ডিতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপীয় তিন-চারিটী প্রধান ভাষা যত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। জগদ্বিশ্রুত ধর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তিনি লণ্ডনে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিচিতা হয়েন। এই পরিচয়ই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে ঐ মহা-পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণে এবং ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে জীবনযাপনে নিয়োজিত করে। শুধু তাহাই নহে, এই পরিচয়ই তাঁহার অন্তরে ভারতের জাতীয় উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গের বাসনা জাগরিত করিয়া দেয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডন ত্যাগের পূর্ব্বেই যে তিনি ঐ মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে সিষ্টার স্বয়ংই লিখিয়াছেন ;—

"The time came, before the Swami left England, when *I addressed him as "Master." I had recognised the heroic fibre of the man, and desired to make myself the servant of his love for his own people.*" ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে

প্রত্যাবর্ত্তনের অনতিকাল পরেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্মে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। উহার অল্পদিন পরেই তিনি স্বামীজি কর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে দীক্ষিতা হইয়া গুরু-প্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করেন। স্বীয় চরিত্র মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে এখন হইতে তিনি শীঘ্রই কলিকাতার আপামর সাধারণের সম্মাননীয়া ও শ্রদ্ধেয়া হইয়া উঠেন এবং স্বেচ্ছায় হিন্দুললনার ন্যায় অন্তঃপুরচারিণী থাকিয়া কলিকাতার হিন্দু গৃহস্থগণের প্রতিবাসিনীরূপে বাগবাজারস্থ বসুপাড়া-পল্লীতে গত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল প্রায় নিয়ত বাস করিয়া আসিতে-ছিলেন। এই স্থানে তিনি হিন্দ্-নারীগণের শিক্ষাবিধানকল্পে যত্নপরায়ণ হইয়া আমেরিকার দু'-একটী সহৃদয়া মহিলার সাহায্যে স্থানীয় বালিকা ও বয়স্থা কন্যাগণের জন্য একটী শিক্ষালয় পরিচালনা করিতেছিলেন। ছাত্রীগণ উহাতে সদ্বংশজাতা মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিতা হইয়া থাকেন। পুরুষ মাত্রেরই উহাতে প্রবেশ অধিকার নিষেধ। সাহিত্য ও লঘু অঙ্ক-শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-স্তোত্রাদি-পাঠ ও নানা শিল্প-কার্য্যের শিক্ষা এই বিদ্যালয়ে কোনও রূপ বেতনাদি গ্রহণ না করিয়া নিয়মিতভাবে দেওয়া হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষিকা শ্রীমতী ওলি বুল নাম্নী মহিলা সম্প্রতি লোকান্তরিত হওয়ায় উহার কার্য্যকারিতা কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে।

সেবাব্রত

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগ্নী নিবেদিতা বাঙ্গালীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বাঙ্গালীভাবেই থাকিতে ভাল বাসিতেন। প্রাচ্য প্রথায় আড়ম্বরমাত্রহীন সামান্য পরিচ্ছদে ভূষিতা রুদ্রাক্ষধারিণী এই দেবীমূর্ত্তিকে পল্লীতে ইতস্ততঃ

ভ্রমণ করিতে দেখিলে মনে হর্ষ ও বিস্ময়ের যুগপৎ সমাবেশ হইত। শুধু বেশভূষায় দৈন্য স্বীকার করিয়া নহে, তিনি নিজ গুরুর জন্মভূমি ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার জন্য তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া আমাদের সেবা ও সাহায্যব্রতেই সম্পূর্ণভাবে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্লেগ নামক মহা-ব্যাধির প্রকোপে যখন সমগ্র কলিকাতাবাসী সন্ত্রাসিত ও বিপর্য্যস্ত, তখন এই দেবী-সদৃশী পরদুঃখকাতরা সহৃদয়া মহিলাকে কতবারই না আমরা রোগশয্যা-পার্শ্বে শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। স্বীয় জীবনের মমতা এককালে বিসর্জ্জন দিয়া, রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে রোগীর নিকট হইতে সরাইয়া দিয়া, মহাসংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে কোলে করিয়া যখন তিনি বসিয়া থাকিতেন, তখন কে না বলিত, তুমি যথার্থই করুণাময়ী দেবী—A ministering angel thou! তাই বলিতেছি, যথার্থই ভগিনী নিবেদিতা মহাপুরুষকর্ত্তৃক ভগবৎকার্য্যে সম্প্রদত্তা হইয়া আমরণ ঐ ভাবেই জীবনযাপন করিয়াছেন!

তীর্থভ্রমণ ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা

তীর্থাদি পরিভ্রমণে ধর্ম্ম ও পবিত্রতা লাভ হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষের নানা তীর্থাদি পর্য্যটন করা তাঁহার অন্যতম সাধনা ছিল। আজকাল আমরা যেমন সচরাচর রেলপথে বারাণসী বা পুরুষোত্তমাদি-ক্ষেত্রে বেড়াইতে বা বায়ু পরিবর্ত্তনে যাই, তাঁহার তীর্থভ্রমণ সেরূপ ছিল না। তীর্থের পথ দুর্গম বা সুগম হউক, তাহাতে তাঁহার নিকট কিছুই আসিয়া যাইত না। হিমগিরির কঠোর চূড়াসমূহ উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি কাশ্মীর প্রদেশের অমরনাথ ও গাড়োয়াল প্রদেশস্থ বদরিকেদার প্রভৃতি দুর্গম ও মহাকষ্টসাধ্য তীর্থাদিতে সানন্দে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে তীর্থ-

মাহাত্ম্য অনুভব ও ধর্ম্মলাভের জন্য তিনি প্রাণপণে বহু আয়াস স্বীকার করিতেন। আবার নানা ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্‌ঘাটনে ঐ সকল তীর্থের প্রাচীনতার প্রমাণ সংগ্রহেও তিনি সবিশেষ যত্ন করিতেন। হিন্দু সাধকের ন্যায় কুণ্ডাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ ধুনীর সমক্ষে ধ্যানপরায়ণা হইয়া তাঁহার বসিয়া থাকিবার কথা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। হিন্দুর নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথাগুলি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং ধ্যান-ধারণা জপ-তপের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, এ-কথা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন।

অর্থ ও শিক্ষা দান

পরদুঃখকাতরা নিবেদিতা পল্লীস্থ অনাথা সহায়হীনা হিন্দু-বিধবাগণকে ও দারিদ্র্যপ্রপীড়িত সাধারণ নরনারীগণকে সদাসর্ব্বদা গোপনে কতই না সাহায্য দান করিতেন! এই সকল দুঃখমোচনানুষ্ঠানে তাঁহার কত অর্থও সময়ই না ব্যয় হইত। নানা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া, শিল্পকার্য্যের সহায়ক নানা যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া এই সকল অসহায়াগণকে শিল্পশিক্ষা দেওয়া তাঁহার এক প্রধান কার্য্য ছিল। তাহারা তাঁহার সহায়তায় আপন আপন শক্তি ও অনুরাগানুসারে শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ অভাবমোচনোপযোগী অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইত। সময়ে সময়ে সিষ্টার স্বয়ংই তাঁহাদের শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন, আবার কখন কখন ঐ সকল অন্যত্র বিক্রয় করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন। বাগবাজার পল্লীর অনেক সম্ভ্রান্ত অথচ নিঃস্ব ভদ্রমহিলা এইভাবে তাঁহার কৃপায় আপন আপন আর্থিক অভাব মোচনে সমর্থ হইয়াছেন।

চারিত্রে

চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও অমায়িকতার কথা স্মরণ করিয়া নিবেদিতাকে ঋষিকন্যা আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিবেদিতা যে বিদুষী ও উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন, এ-কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বিবিদিষা ও শিক্ষা নিজ পার্থিব উন্নতি সাধনের দিকে কখন নিয়োজিত হয় নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মানব-মনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজসমূহ রোপণ করাই হয়, তাহা হইলে ভগিনী নিবেদিতা যথার্থ ই উচ্চশিক্ষাসম্পন্না ছিলেন। নিঃস্বার্থপরতা গুণে যদি মনুষ্য দেবতার স্থানভাগী হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, ভগিনী নিবেদিতা মানবী হইয়াও যথার্থ ই দেবী-পদবী অধিকার করিয়াছিলেন। নিরভিমানিতাই যদি যথার্থ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, নিবেদিতার ন্যায় সুপণ্ডিতা সংসারে বিরল।

সনাতন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা

মিশনরী-কুহকে পড়িয়া ভারতবাসী কেহ কেহ যেমন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভগিনী নিবেদিতা জগদ্‌বিশ্রুত আচার্য্য ও বাগ্মী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় বিমোহিত হইয়া সে ভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নাই। তীক্ষ্ণ-বিবেকবুদ্ধিসম্পন্না, ন্যায় ও সত্যানুরাগিণী, মহাতেজস্বিনী এই ইংরাজ মহিলা অতি সন্দিগ্ধ মনে ও সতর্কতার সহিত যুক্তি ও গবেষণাদ্বারা প্রত্যেক বিষয় সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া তবে স্বামীজি-প্রচারিত হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বসমূহে ধীরে ধীরে হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ঐ বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে মন্দ হইবে না।

"But his system as a whole, I, for one, viewed with suspicion, as forming only another of those theologies which if a man should begin by accepting, he would surely end by transcending and rejecting. And one shrinks from the pain and humiliation of spirit that such experiences involve." এইরূপে ভয়ে ও সন্দেহে আলোচনা আরম্ভ করিলেও পরিশেষে হিন্দুধর্ম্মানুগত সত্য ও অপার সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তিনি মুগ্ধা হইয়াছিলেন।

আত্মোৎসর্গ ও শিক্ষা-বিস্তার

এইবার তাঁহার সমাজ-ত্যাগের কথা। আমাদের সমাজ-ত্যাগ তাঁহার ত্যাগের তুলনায় যে কত দূর অকিঞ্চিৎকর, তাহা বুঝাইয়া বলা দুঃসাধ্য। উচ্চকুলসম্ভূতা ও উচ্চশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলার পক্ষে সত্যের অনুসন্ধানে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, কৈশোর ও যৌবনের দৃঢ়াঙ্কিত স্মৃতিরাশি অপসৃত করিয়া, ধনৈশ্বর্য্য ও লীলা-বিলাসের কেন্দ্রভূমি ইউরোপ এবং ইউরোপীয় সভ্যতা উপেক্ষা করিয়া ও স্বীয় পরম প্রেমাস্পদ আত্মীয়-স্বজনাসক্তি বিস্মৃত হইয়া আপাত-দৃষ্টিতে জঘন্য, মহামারি-হাহাকার-পরিপূর্ণ, ভোগমাত্রৈক-বিহীন, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, অস্থিকঙ্কালসার নরনারী-বেষ্টিত এই ভারতবর্ষে আসিয়া দারিদ্র্যব্রতাবলম্বনে লোকহিতের জন্য কালযাপন করা কত কঠিন, কত কষ্টকর, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধন্য ভগিনী নিবেদিতা! ধন্য তোমার ত্যাগ, ধন্য তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা! তুমি যে ভাবে হিন্দুধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলে, অহিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুমি যে ভাবে হিন্দুকে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সহিত মিশিয়াছিলে এবং হিন্দুসমাজের বিজাতি-বিদ্বেষ নাশ করিবার

নিমিত্ত তুমি যে ভাবে সর্ব্বস্বত্যাগিনী ও ব্রতধারিণী হইয়া ঐ বিদ্বেষ-বহ্নিতে, নিজ অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে শান্তিবারি সেচন করিয়া গিয়াছ, অদ্যাবধি কোনও বিদেশীয় নর বা নারী তাহা করেন নাই বা করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। তোমার Lambs among Wolves (Missionaries in India) নামক অপূর্ব্ব সন্দর্ভ পাঠে ইউরোপীয় সভ্য-জগৎ চমৎকৃত, নিন্দকদল লাঞ্ছিত ও হিন্দুধর্ম্ম গৌরবান্বিত। তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী জগদম্বার সেবিকা হইয়া আপনাকে মহিমান্বিতা জ্ঞান করিতে। বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী মহাকালীর উপাসনায় তোমার প্রেমাশ্রু ঝরিত। তুমি মৃন্ময়ী দেবীমূর্ত্তিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ীর আবির্ভাব দেখিয়া শক্তিপূজার যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলে এবং হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজার স্বপক্ষে তীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণ করিয়া, Kali Worship ও Kali the Mother নামক প্রবন্ধদ্বয়ে ঐ বিষয়ের বিরোধী মতসমূহ খণ্ডন পূর্ব্বক হিন্দুর স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা প্রতিপন্ন করিয়াছ। তোমার of Cradle Tales of Hinduism ও The Web of Indian Life বিদ্বেষিগণের চক্ষুঃশূল হইয়াও অনেকানেক ভারতানভিজ্ঞের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতেছে। An Indian Study of Love and Death নামক পুস্তিকায় তোমার হৃদয়ে সৌন্দর্য্য ও মহাপ্রাণতা যে কতদূর ছিল, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। তোমার Glimpses of Famine & Flood in Eastern Bengal নামক সন্দর্ভে কত কথাই না কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রকৃত সন্ধান প্রদান করিয়াছ! The Indian World, The Indian Review, Prabuddha Bharat এবং The Modern Review নামক মাসিক পত্রসমূহে তুমি যে সকল জ্ঞানগর্ভ, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছ, তত্তৎপাঠে কত লোকেরই মন না আলোকিত হইয়াছে!

সৌন্দর্য্যানুভূতি

আবার আর এক বিষয়ে তোমার অভাবনীয় অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সেটী তোমার শিল্পসৌন্দর্য্যানুরাগ। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব শিল্পানুরাগ বিশিষ্ট শিল্পীরও অনুকরণীয়। ভারতীয় নানা কলা-শিল্পের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তুমি যে ভাবে তাহাদের জীবন্ত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছ, কয়জন শিল্পী আজ তেমন ভাবে শিল্প-সৌন্দর্য্যের ধ্যান-পরায়ণ থাকিয়া প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান দিতেছেন? ভারতের নানা তীর্থাদি ও পুরাতন গ্রাম, নগর, গিরিগুহাদিতে গমন করিয়া এবং স্বয়ং না যাইতে পারিলে তথায় লোক প্রেরণ করিয়া, Camera সাহায্যে প্রাচীন স্থাপত্যের ও শিল্পসৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি উঠাইয়া আনিয়া প্রাচীন শিল্পকলাসমূহের সৌন্দর্য্য বুঝিতে ও বুঝাইতে তুমি কতই না কৌতূহল ও আনন্দ প্রকাশ করিতে!

শেষ কথা

আবার সাহিত্যবিভাগে গ্রন্থরচনায় সুপরামর্শদানে কত বাঙ্গালী গ্রন্থকারকেই না তুমি সাহায্য করিয়াছ! গ্রন্থবর্ণিত বিষয়সম্বন্ধে গ্রন্থকারদিগের নিজ জ্ঞানাতিরিক্ত সম্পদ-সাহায্যদানে ও সময়ে সময়ে তাঁহাদের গ্রন্থের কতকাংশ নিজে লিখিয়া দিয়া তুমি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদিগকে যে কত সাহায্য করিয়াছ, তাহা প্রকাশ করা যায় না। তোমার বক্তৃতা, নিবন্ধ ও সন্দর্ভাদি পাঠে অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গবেষণার সহিত লোকহিতৈষণার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? কে না হৃদয়ের শ্রদ্ধা তোমায় ঢালিয়া দেয়? তোমার হিন্দুধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তোমার স্বদেশবাসিগণ অনেক সময়ে তোমার উন্নত মনের উদারভাবসমূহ বুঝিতে

সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তোমার চরিত্রের মাধুর্য্যে তাহারাও মোহিত ও চমৎকৃত। কিন্তু তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, তোমার চিত্তসৌন্দর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, তোমার গুরুপূজা-ব্রতানুষ্ঠানের অন্তিম পুষ্পাঞ্জলি, "The Master As I Saw Him." বাঙ্গালীর নিত্যপূজ্য, শ্রদ্ধার আধার, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির জলন্ত মূর্ত্তি এবং স্বদেশপ্রেমিকগণের শীর্ষস্থানীয় তোমার গুরু তোমায় নিজ কার্য্যে নিয়োজিত করিবার সময় তোমাকে অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন, যাবজ্জীবন আমি তোমার সহায়তা করিব—"I shall stand by you unto death"—তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ঐ মহাবাক্যই যে তোমার হৃদয়ে সদাসর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া সারা জীবন তোমাকে সকল কার্য্যে অদম্য উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া রাখিত এ-কথা তোমার অলৌকিক জীবন এবং ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থ দেখিয়াই উপলব্ধি হয়। তুমি নিজ নামসাক্ষর-কালে লিখিতে "Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda"; তোমার জীবনালোচনা করিলে মনে হয়, যথার্থই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ চিরদিনের জন্য তোমার অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন! তুমি তাঁহাদেরই! ভক্ত ও ভগবান্ যদি অভেদ হয়, তবে তুমিও তোমার উপাস্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সহিত অভেদ-পদবী লাভ করিয়াছ। তোমার "The Master As I Saw Him" গ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই তোমার গুরুদেব শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের অলৌকিক জীবনের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার চরণতলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিতে অগ্রসর হইবেন। শুধু তাহাই নহে, গুরুমাহাত্ম্যপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ অমূল্য গ্রন্থ, তুমি স্বয়ং কতই যে মহৎ ছিলে, তাহাও সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে। দারজিলিঙ্গের গিরিশৃঙ্গে তোমার নশ্বর মায়িক দেহ সে-দিন ভস্মসাৎ হইল; ধর্ম্মজীবনের কঠোর সাধনায় ও লোকহিতৈষণার অতিরিক্ত পরিশ্রমে

তোমার কুসুমসুকোমল দেহ বিশুষ্ক হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল—হিমালয়শৃঙ্গে, মহাদেব-অঙ্গে, নিবেদিতার পূর্ণ নিবেদন হইল!—কিন্তু ভগবৎ-রাজ্যে ইংরাজি ভাষার যতদিন অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তোমার অদ্ভুত জীবনের সুমহান্ মহিমা ভারতে কীর্ত্তিত হইবে এবং ভারতবাসীর অন্তঃকরণে, বিশেষতঃ, বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে তোমার কর্ম্মময়ী পবিত্র জীবনগাথা চিরকাল গীত হইয়া তোমার মধুময়ী স্মৃতি জাগরিত করিয়া রাখিবে। তোমার চরমকালীন শেষ বাণী—"The boat is sinking, but I shall yet see the Sun-rise",—তুমি যে শ্রীগুরুর কৃপায় মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছিলে, তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে! আমরা তোমাকে বারবার প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুসমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে ইহাই প্রার্থনা করি, যেন আমরা তোমারই ন্যায় সর্ব্বতোভাবে 'লোকহিতায়' আত্মনিবেদন করিতে পারি! *

* বিগত ৬ই কার্ত্তিক (১৩১৮) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস ৺রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে বাগবাজারবাসীর অনুষ্ঠিত সিষ্টার নিবেদিতার শোক-সভায় পঠিত—সভাপতি—'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়।

নাট্য-সাহিত্য-সম্রাট *

-০ঃঃ*ঃঃ০—-

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগমনে

জন্ম ১২৫০।১৫ই ফাল্গুন, মৃত্যু ১৩১৮।২৫এ মাঘ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য, বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদাতা, বঙ্গের গৌরব-রবি, বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য-জগতের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড, নটকুলকেশরী, বহুবিদ্যাবিশারদ, অসাধারণ প্রতিভাশালী, কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ২৫এ মাঘ, বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় নশ্বর মায়িক দেহ বিসর্জ্জন দিয়া রামকৃষ্ণ-লোকে গমন করিয়াছেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন একদিন লিখিয়াছিলেন,—

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে !"

নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্রের কথা জানেন না, এমন বাঙ্গালী কেহ আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অষ্টষষ্টিতম বৎসরব্যাপী দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে চুয়াল্লিস বৎসর কাল যিনি বঙ্গের নাট্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, যিনি নট-জীবন গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পর হইতেই জীবনের গতি স্থিরীকৃত করিয়া গন্তব্য পথে আমরণ বিচরণ করিয়া আজ অমর হইয়াছেন ; বঙ্গীয়

* বসুমতী, ৫ই ফাল্গুন, ১৩১৮

নাট্য-সাহিত্যের যুগান্তরকারী বাণীর সেই বরেণ্য সুসন্তান, একাধারে বঙ্গের সেক্‌স্‌পিয়ার ও গ্যারিক গিরিশচন্দ্র বঙ্গদেশে আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু সেই পুরুষসিংহ আজ চির-নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। মহামায়ার শান্তিময় ক্রোড়ে রামকৃষ্ণ-তনয় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। এ নিদ্রায় আর জাগরণ নাই অথবা এ নিদ্রায় চির-জাগ্রৎ থাকিয়া 'ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে'।

নাটক-রচনা ও নট-জীবন

গিরিশচন্দ্রের রচিত নাটকগুলিই তাঁহার অমর কীর্ত্তি। বর্ত্তমান কাল গিরিশচন্দ্রের যথাযোগ্য পূজার সময় না হইলেও আগামী ভবিষ্যৎ কালের বঙ্গসন্তানগণ এই মহাপুরুষের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া চিরকৃতার্থ হইবে, তাহার আভাষ বেশ অনুমিত হইতেছে। গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত পূজাকাল বর্ত্তমান নহে—তাহার বহু কারণ বিদ্যমান। ভাবুক ব্যক্তি ইঙ্গিতে বুঝিবেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তিগণের মধ্যে তিনি অনেকের অপেক্ষা উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইলেও কালোপযোগী স্বধর্ম্মে তিনি সে সম্মানে বঞ্চিত, এ-কথা তাঁহার নাটকাবলীর নিবিষ্ট পাঠক মাত্রেই অবগত। নট-জীবন যাপন করিয়া তিনি তথাকথিত সভ্যসমাজ হইতে চিরবিচ্যুত; কিন্তু আমরা জানি, তিনি এমন 'সাজা গোজা' আত্মগোপনকারী সমাজে মিশিতে বা প্রতিষ্ঠিত হইতে কখনও প্রয়াসী হয়েন নাই।

আশীখানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনাবলীর রচয়িতা হইয়াও, আমরা জানি, বন্ধুত্ব-হিসাবে ব্যতীত তিনি কখনও কাহাকেও স্বীয় নাটকাবলী সমালোচনার্থ উপহার দেন নাই। আজকালের অনেক লেখকের ন্যায় কখনও কোনও পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের দ্বারস্থ হয়েন নাই বা কোনও

বন্ধুবান্ধবকে স্বীয় পুস্তকাবলীর বা নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা (প্রধানতঃ প্রশংসা) করিতে অনুরোধ করেন নাই।

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের যাঁহারা ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ দেখিতে পাইবেন যে, এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মানবচরিতাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত নাটককার গিরিশবাবু কবিকেশরী রামনারায়ণ, কবিবর মধুসূদন বা নটকবিকুলভূষণ দীনবন্ধু (গিরিশবাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ নাটককারগণ) প্রবর্ত্তিত প্রথাগুলি গ্রহণ না করিয়া নূতন আদর্শে, নূতন প্রথায়, নূতন ভাষায় নাট্যসাহিত্য-সেবায় ব্রতী হইয়া সফল মনোরথ হইয়াছেন। তাঁহার রচিত নাট্যগ্রন্থাবলী দীনা বঙ্গভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব কি পরিমাণে বর্দ্ধন করিয়াছে, তাহা নাট্যসাহিত্যকোবিদ মাত্রেই অবগত আছেন। নাট্যজগতে তিনি নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান অনেক লেখক তাঁহার পথানুসরণ করিতেছেন। আজকালকার কয়েকটি সাহিত্যিকের নিকট আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, বাঙ্গালা ভাষায় ভাল নাটক জন্মাইতেছে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে কোনও মহাত্মা অগ্রসর হইয়া একখানি আদর্শ নাটক রচনা করিয়া অদ্যাবধি নাট্যসাহিত্য-জগতকে অলঙ্কৃত করিলেন না। যাক্ সে কথা। আজ গিরিশচন্দ্রের পরলোক-গমনে বর্ত্তমান বঙ্গীয় নাট্যজগৎ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহার ইয়ত্বা করা যায় না। বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের এমন একজন বীর স্রষ্টা আবার কত কাল পরে জন্মগ্রহণ করিবেন, কে বলিতে পারে।

উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইয়া যিনি বিদ্যাবলে নাট্যরচনায় ব্রতী হইতে পারেন, তিনিই উৎকৃষ্ট নাট্যকার হইতে পারেন। আমাদের দেশের গিরিশবাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককারগণ কেহই অভিনেতা ছিলেন না, এখনকার নাটককারগণের মধ্যেও যাঁহারা দুই দশখানি ভাল নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত কেহই উৎকৃষ্ট অভিনেতা নহেন বা

নটের জীবন তাঁহারা আদৌ গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাটককার সেক্সপিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন এবং আমাদের ধারণা এই যে, তিনি নটের জীবন গ্রহণ করিয়া, নাটক বুঝিয়া, নাটককার হইয়াছিলেন ; এবং এই জন্যই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। গিরিশচন্দ্র নট-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার আসন অধিকার করিয়াছিলেন, নটত্ব তাঁহার মজ্জাগত হইয়াছিল, তাই তিনি বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি, যদি কেহ কোন বিভাগে সাফল্য বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রয়াসী হইতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই বিভাগ-বিশেষের প্রেমেই আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। সেই বিভাগ বিশেষেই যেন তিনি ধ্যানে-জ্ঞানে, শয়নে-স্বপনে সদাসর্ব্বদা নিমজ্জিত থাকেন। অনেকে অনুযোগ করিয়া থাকেন, গিরিশচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে আর কেন রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে থাকেন, কিন্তু সেই অনুযোগের উত্তর তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন,

"রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশার নেশায় করি জীবন যাপন !"

নট, নাটক ও নাট্যশালাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। ইহাদের উন্নতির সাধনই তাঁহার জীবন-ব্রত। আজ আটষট্টি বৎসরব্যাপী দীর্ঘ জীবনের অবসানে তিনি স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রায় সকলেই, বিশেষতঃ, যাঁহারা নাট্যকলাপ্রিয় বা নাট্যানুসন্ধিৎসু, অবগত আছেন যে, তিনি নিজে উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইয়াই নট-জীবনের কার্য্য শেষ করেন নাই। বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালার জন্মদাতা এই মহানটের শিক্ষাধীনে থাকিয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় নাট্যজগৎ উন্নতিলাভ করিয়াছে। অভিনয় শিক্ষাদানে তিনিই একমাত্র আচার্য্যস্থানীয় থাকিয়া আজীবন কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সহচরগণকে এই কলাবিদ্যা প্রাণপাত পরিশ্রমে শিক্ষাদান

করিয়াছেন। বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালাসংশ্লিষ্ট লোকান্তরিত দুই-একজন ব্যতীত এমন কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী নাই, যাঁহারা তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে প্রয়াসী নহেন। কাহার নাম করিব, বঙ্গের সেই নট-কুল-শিরোমণি ৺মহেন্দ্রলাল বসু, ৺অমৃতলাল মিত্র, ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু), ৺মতিলাল সুর প্রভৃতি অভিনেতৃ-কুল-চূড়ামণিগণ সকলেই তাঁহার শিক্ষায় পুষ্ট হইয়া গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন ও চিরযশস্বী হইয়া গিয়াছেন। অভিনেত্রীকুলের কথা এই মাত্র বলিলেই হয় যে, যে অভিনেত্রী তাঁহার শিষ্যা নহেন, তিনি অভিনেত্রী হইতেই পারেন নাই। অর্থাৎ কি উৎকৃষ্ট, কি সামান্য শিক্ষিত অভিনেত্রী মাত্রেই তাঁহার নিকট এ বিষয়ে ঋণী। এই মহাপুরুষের সংশ্রবে ও শিক্ষাধীনে আসিয়া ও থাকিয়া বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অভিনয়-পারিপাট্যে দর্শকগণকে মোহিত করিয়া উচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন ও পাইতেছিলেন।

মানুষ-হিসাবে

আবার সামাজিক মানুষ হিসাবে আর এক কথা বলি। গিরিশচন্দ্রের ন্যায় কয়জন সুপণ্ডিত আজকাল সমাজ-লাঞ্ছিত, 'বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো' যুবকদলকে আনন্দে ক্রোড়ে করিয়া, এমন কি, ঐ সমাজ-ঘৃণিত বারাঙ্গনাগণকে স্নেহ দান করিয়া, আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন? মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, সাধু, পাপী গিরিশচন্দ্রের নিকটে সকলেই সমাদর পাইত। তিনি সমাজভয় পদদলিত করিয়া পুরুষর্ষভের ন্যায় পতিতকে উন্নতের মত সমান আলিঙ্গন দান করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'বাপু হে, এ অধম, এ দীনহীন অন্ততঃ একজন 'প্রাকৃত লোকের সঙ্গ করিবার

সুযোগ পাইয়াছিল, সেই সঙ্গ-বলেই সে লোক চিনিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই শিক্ষাই সমদৃষ্টি আনিতে শিখাইয়াছে'। বাইবেলের সেই উচ্চশিক্ষা— "Be perfect as the Father in heaven is perfect"— গিরিশচন্দ্রের মজ্জাগত ছিল। তাই আচণ্ডাল তাঁহার কোল পাইয়াছিল! তাই সে বৎসর দুর্গোৎসবের সময়ে একদিকে মহাবিদ্যারূপিণী দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দালান-মণ্ডপে সুসজ্জিতা, অন্যদিকে অবিদ্যারূপিণী মানবী-মূর্ত্তি প্রসাদ-প্রার্থিনী হইয়া বিরাজমানা। তাঁহার নাটকাবলীর আদর্শ চিত্রগুলিতেও ঐরূপ বিশ্বপ্রেমের উচ্চশিক্ষা বর্ত্তমান। 'বিল্বমঙ্গলে'র সেই পাগলিনী, 'নশীরামে'র নশীরাম, 'কালাপাহাড়ে'র চিন্তামণি, 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল প্রভৃতি বহুতর চিত্রে সেই উচ্চ আদর্শ, সেই বিশ্বপ্রেম, সেই দেব-মানবের একত্র সমাবেশের মধুরোজ্জ্বল ছবি বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নয়নে চিরজ্যোতিষ্মান্ হইয়া রহিয়াছে।

শিক্ষা-বিস্তারে

গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্য-সেবা মাত্র নাটকীয় চরিত্র চিত্রণের উদ্দেশে পর্য্যবসিত নহে। তাঁহার 'চৈতন্য-লীলা', 'রূপসনাতন', 'বুদ্ধদেব-চরিত', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'করমেতি বাই', 'নশীরাম', 'কালাপাহাড়', 'শঙ্করাচার্য্য' ও শেষের সেই 'তপোবলে' ধর্ম্মজগতের যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সুপ্রকাশিত, আজ-কালের কয়খানা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে তাহা পরিস্ফুট, তাহা বলিতে পারি না। থিয়েটার দেখিতে গিয়া কাহারও কাহারও নৈতিক অবনতি ঘটে, সমাজ বিশেষ হইতে মাঝে মাঝে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠে ও রঙ্গমঞ্চে তাহাদের অভিনয় দেখিয়া কত লোকের যে উচ্চ শিক্ষালাভ, ধর্ম্মতত্ত্বের উপলব্ধি ও মনোন্নয়নের সুযোগ ঘটিয়াছে তাহা কি তাঁহাদের আদৌ গোচর নহে? এক

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' এক 'বুদ্ধদেব চরিত' এক 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখিয়া বঙ্গের শত শত প্রাণ উন্নত, শত শত ভ্রমান্ধ ও পথহারা জ্ঞানো-দ্ভাসিত ও সুপথপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বহুজনবিদিত। হিন্দুশাস্ত্রের গুহ্যতম দার্শনিক তত্ত্বসমূহ গিরিশবাবু নাটকীয় চরিত্র-মুখে যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কয়জন দার্শনিক বর্ত্তমান বাঙ্গালীকে সেভাবে সেই সকল উচ্চতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন? নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ, এ কথা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থরাশিতে কি ধর্ম্মভাব, কি সামাজিক শিক্ষা, কি স্বদেশ-প্রেম সকলগুলিই সমভাবে বর্ত্তমান ও সুপরিস্ফুট।

শেষকথা—একদিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'দেখ, আমি গ্রন্থকার হইয়া শিক্ষকের স্থান অধিকার করিব, বা নাটকের চরিত্র-সৃষ্টিমুখে সমাজকে শিক্ষা দিব, এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার হই নাই। নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ থাকায় নাট্যশালার জন্যই আবশ্যক মত অভিনেয় পুস্তকাদি লিখিয়াছি, গ্রন্থকার হইবার সাধ নাই।' ধন্য নিরভিমান গিরিশচন্দ্র! তুমি উচ্চশিক্ষা দান অকাতরে করিয়াও শিক্ষকের পদবীতে আসীন হইতে ইচ্ছুক নহ! আর একদিন বঙ্গীয় নাট্যশালার পিতা বা জনক ইত্যাদির আলোচনায় আত্মগোপন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখ বাবাজি, আমোদ করিবার জন্য খেলার (Pastime) ছলে আমরা থিয়েটারের দল বসাই, তা' নিয়ে অত তর্কবিতর্ক কেন?' তাই বলি, ধন্য গিরিশচন্দ্র! ধন্য তোমার দীনতা, তোমার দীনতাই তোমায় আজ নাট্য-সম্রাটের আসন দিয়াছে, তোমার আত্মগোপন-চেষ্টাই তোমায় বঙ্গীয় নাট্য-শালার জন্মদাতা বলিয়া বিঘোষিত করিতেছে! পরিশেষে তোমার শিষ্যানু-শিষ্য আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা যেন তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া সেই উপদেশমত অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে পারি,—

"অভিমান কর পরিহার, চূর্ণ কর
বল অবিদ্যার, জেনো সার—অহঙ্কার
নরক দুস্তর। শক্তি কার ? মূলাধার
ভগবান্—শক্তির আকর, ভাবে মুগ্ধ
নর শক্তিধর আপনারে ! জলধরে
বর্ষে বারিধারা, চলে প্রণালী বহিয়ে
জল, জল নহে প্রণালীর। জেনো স্থির
শক্তি সেই মত ! অনিবার্য্য ফলে কার্য্য
ঈশ্বর ইচ্ছায় ; হয় মানব-নিচয়
ফলভোগী তার—কর্ত্তাজ্ঞানে আপনায়।
অহম্ অহম্ ত্যজ বিচক্ষণ ! জপ
'তুঁহু তুঁহু' 'নাহম্ নাহম্' ; পাশমুক্ত হবে
হৃদিপদ্মে বসিবেন শান্তিদেবী—"

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ! তোমার শ্রীপদে আজ শত শত ভক্ত শিষ্য ও গুণগ্রাহী পাঠক পুষ্পাঞ্জলি ও অর্ঘ্য দানে আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিবে। তোমার অসীম প্রেমের, দয়ার ও স্নেহের এক কণাও আমরা পাইয়াছিলাম ; সেই ভরসায় আজ এই দীন অধম তোমায় সামান্য কয়েকটী গন্ধহীন শেফালিকা হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত মিশ্রিত করিয়া তোমার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতেছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস গুণহীনের দান হইলেও তোমার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা-গুণে ইহা গ্রহণ করিয়া এ অধমকে কৃতার্থ করিবে।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ ! শান্তিঃ !

মহাত্মা প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী *

যে মহাত্মার জীবন-কথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া আজ আমরা এই বিদ্বজ্জনসমাজে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি, তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক না হইলেও, বঙ্গে ও সাহিত্য-ভাণ্ডারে অন্ততঃ এমন একটী মহোজ্জ্বল রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার সৌন্দর্য্য আচির বর্ত্তমান থাকিবে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি Thomas Gray (টমাস্ গ্রে) "Elegy Written on a Country Churchyard" পল্লীগ্রামের সমাধিস্থানে লিখিত একটি শোকগাথা) নামক কবিতাটি লিখিয়াই চিরযশস্বী হইয়াছেন। জন্ বনিয়ান্ (John Bunnyan) "Pilgrims Progress" (তীর্থযাত্রীর যাত্রা-বিবরণ) নামধেয় সন্দর্ভ রচনা করিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি মাত্র শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ রাখিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছেন। আমাদের বঙ্গের এই চিন্তাশীল সারস্বত প্রেমিকও তদ্রূপ "জীবন-পরীক্ষা" নামক মানবীয় মনস্তত্ত্বের একখানি মাত্র রূপকেতিহাস মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন এবং বাঙ্গালীর ও বঙ্গীয় পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন! ইহাঁর "জীবন-পরীক্ষা", "আনন্দ-তুফান", "মদখাও নেশা ছুটিবে না" প্রভৃতি সন্দর্ভগুলির ভাবসৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য হইতেই আমরা ভাবুক ও রসিক প্রিয়নাথকে চিনিতে পারি এবং তাঁহার প্রকৃত জীবন-কথা জানিতে পারি। প্রিয়নাথকে চিনিবার এই একটা দিক্। আর একদিকে তাঁহার পূত আচার-ব্যবহার। এই দুইদিক্ হইতে অনুসন্ধান

---

* উদ্বোধন, ১৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৩১৯

করিলে আমরা জানিতে পারি যে, লেখক হিসাবে তিনি যেমন ভাবুক ও প্রেমিক ছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপেও প্রিয়নাথ তেমনি চরিত্রবান্, বন্ধুবৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, দীন, পরহিতচিকীর্ষু, আদর্শ মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান কথাগুলি আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিচয়

বাঙ্গালার চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত গোকর্ণী নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে ১২৭০ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক দীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন নৈষ্ঠিক সেকালের ব্রাহ্মণ, নাম ৺ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম শ্রীমতী বরদায়িনী দেবী। পিতার সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। গ্রামের সামান্য আয়বিহীন জমা-জমি মাত্র সম্বল ছিল। এই দরিদ্র নিঃস্ব পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আজকালকার শিক্ষা যাহাকে বলে, প্রিয়নাথের ভাগ্যে সেরূপ শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে নাই। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষা মাত্র আয়ত্ত করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় গুণে সৎশাস্ত্রাদির আলোচনা ও ভগবৎপ্রসঙ্গে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়া প্রিয়নাথ কালে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সংসারী হইয়াও যোগীর পদবী অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পিতামাতার পরমভক্ত এবং পরিজনবর্গের উপর অত্যধিক প্রেমশীল ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত অবয়বযুক্ত বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু আকৈশোর শ্বাসব্যাধি-কবলিত হইয়া প্রিয়নাথের সুঠাম ও বলবান দেহ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিত। ঐ ব্যাধির দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাই প্রিয়নাথের ইচ্ছানুরূপ

সারস্বস্বত সেবার ও ইষ্ট-সাধনের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল। অপর কোন ব্যাধি প্রিয়নাথের পূত কলেবরকে কখনও স্পর্শ করে নাই, তবে তাঁহার আর এক সময়ের অসুস্থতার কথা আমরা অবগত আছি—যে সময়ে কিছুকালের জন্য তিনি বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ৪৫ বৎসর মাত্র ব্যাপী সামান্য জীবনকাল যদি ঐরূপভাবে ব্যাধিকবলিত না হইত, তাহা হইলে আমরা আরও কতই না উচ্চ ভাবোদ্দীপক সৎগ্রন্থ তাঁহার লেখনী হইতে প্রাপ্ত হইতাম!

কলিকাতার অনেকগুলি গণ্যমান্য ধনাঢ্য ও কৃতবিদ্য মনীষী প্রিয়নাথের চরিত্র মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা দান করিতেন। পরমার্থভাব-ভাণ্ডারস্বরূপ তাঁহার গ্রন্থনিচয় পাঠেই ইঁহারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। শ্যামবাজারের স্বর্গীয় লোকপ্রিয় জমিদার রায় বিপিনবিহারী মিত্র, জোড়াসাঁকোর বদান্য সুধী ৺শ্যামলাল মল্লিক, বাগবাজারের রায় নীরদকৃষ্ণ দত্ত, পানিহাটীর ৺ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের ইনি সম্মানিত বন্ধু ছিলেন। শোভাবাজার রাজ-বংশের দৌহিত্র, পণ্ডিত ও ভগবৎ-প্রেমিক স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু, 'অপূর্ব্ব কারাবাসা'দি গ্রন্থ-প্রণেতা সুপণ্ডিত ৺কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন মনীষিবর ৺রাজনারায়ণ বসু ও দেশবিশ্রুত, অধুনা অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বহু দেশ-পূজ্য ও মহামান্য সুধীবৃন্দ এই মহাত্মার গ্রন্থ পাঠে ইঁহার সহিত পরিচিত হইয়া ইঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা, সম্মান ও স্নেহ দান করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার সময়ে সময়ে এই দীন গ্রন্থকারকে গ্রন্থ মুদ্রণে, এবং ইঁহার পারিবারিক অভাব মোচনে সাধ্যমত অর্থাদি দানে ইঁহার উপর তাঁহাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সাধনা

মহাত্মা প্রিয়নাথের সাধনেতিহাস অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত আছে; কারণ, গোপনে ভগবৎ-সাধনে নিরত থাকিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। নতুবা সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহাকে কেহ কখনও দশ জনের অনুষ্ঠিত প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইতে দেখেন নাই। 'জীবন-পরীক্ষা'দি গ্রন্থরচনার বহুকাল পরে তিনি স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন, 'জীবন-পরীক্ষা'দি গ্রন্থ-নিবন্ধ প্রেম-পীযূষ-পরিপূরিত পরমার্থতত্ত্বসকল জ্ঞানী গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনা-শক্তিপ্রসূত কয়েকটী জ্ঞানগর্ভ পারলৌকিক উপদেশ-বাক্য মাত্র। কিন্তু আমাদের ধারণা, যে কল্পনা ভাবরাজ্যের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিয়া এই সকল মানব-কল্যাণকর মহাতত্ত্বরাশি তুলিয়া আনে—সে কল্পনা সামান্য কল্পনা নহে। প্রকৃত-শান্তি-সুখান্বেষী প্রিয়নাথ যে কেবল মাত্র একজন প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু তিনি বাহ্য ক্রিয়াকলাপে অনুরাগবিহীন হইয়াও পরাভক্তিলিপ্সু, অধ্যাত্ম-তত্ত্বান্বেষী সাধক ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিরাশির ফল ভগবৎ কৃপা সহজে প্রাপ্ত হওয়ায় ধর্ম্মরাজ্যের বাহ্য অনুষ্টানসকলের আবশ্যকতা তিনি অনুভব করেন নাই এবং ঐ কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই জীবন-পরীক্ষার ন্যায় উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রণয়নে শক্তিমান্ হইয়াছিলেন।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী মতামত হইতে আমাদের ঐ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে :—

শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন—(জীবন-পরীক্ষা),

"এখানি উচ্চদরের পুস্তক, উচ্চকথায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থ দেখিয়া ইহার রচয়িতাকে চিন্তাশীল ও সাধনপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের রচনায় গ্রন্থকারের ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়, সে ধাতু সাধুলোকের ধাতু। রচনা বুঝি সেই জন্যই এত সাধু হইয়াছে।"

অপূর্ব্ব কারাবাসাদি গ্রন্থরচয়িতা পণ্ডিত ৺কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—"দৈববৃত্তি আছে বলিয়াই মানব ধার্ম্মিক। তবে ঐ বৃত্তির অল্পাধিক্যানুসারেই মানবের জাতি ভেদ। বহু চেষ্টাতেও কাহারও ঐ বৃত্তি স্ফুরিত হয় না আবার বিনা চেষ্টাতেও কোন কোন স্থানে ঐ ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। 'জীবন-পরীক্ষা'র গ্রন্থকার এই শেষোক্ত ভাবেরই ভাবুক, শেষোক্ত ভাবেরই প্রেমিক, দৈবভাবই ইহাঁর জীবনের স্থায়ীভাব। তাদৃশ পঠন সাধনাদির অভাবেও এই গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ে যেরূপ অসাধারণ ভক্তি ও প্রগাঢ় প্রেম লক্ষিত হইল তাহা অতীব আনন্দজনক। গ্রন্থকারের শাস্ত্রে তাদৃশ শিক্ষা অভাবেও গ্রন্থে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয় না। জ্ঞানের আভাষ যে শিক্ষার আভাষকে পরাভূত করে, 'জীবন-পরীক্ষা' তাহার একটী নিদর্শন স্থল।"

বাস্তবিক সাধু প্রিয়নাথ যে উচ্চদরের সাধক ও ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত পরম ভক্ত ছিলেন এ-কথা তাঁহার গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। বুঝা যায় যে, তিনি আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে জীবনপাতী পরিশ্রম করিয়াছেন। বুঝা যায় যে, 'জীবন-পরীক্ষা' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য—'কে আমরা ?' 'কেন আমরা এখানে আসিয়াছি ?' 'এখানে আসিয়া আমরা কি করিতেছি ?' —এই সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতেই তিনি আত্মজ্ঞানের আভাষ লাভ করিয়াছিলেন এবং সে জন্যই লিখিয়াছিলেন—'সাধ নিজের মঙ্গল, নিজময় এ বিশ্বমণ্ডলী।' ঐ জ্ঞানের ফলেই তিনি নিজরচিত 'আনন্দ-তুফানে' আত্মবিস্মৃত সাধারণ মানবকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন :—

"পেয়েছ দুর্ল্লভ দেহ, মনুষ্য আকার,
চাহ ভাই আপনার পানে, 'তুমি' ভিন্ন
নাহি বিশ্বে কিছু আর।"

ঐ সকল রচনা হইতে বুঝা যায় প্রিয়নাথ তথাকথিত নীরস, তার্কিক, বেদান্তবাদী ছিলেন না, কিন্তু যে অদ্বৈত জ্ঞানে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করিয়া মানব-মনে পরম প্রেমের অস্তিত্ব সদাসর্ব্বদা জাগরূক রাখে, প্রিয়নাথ সেইরূপ আত্মজ্ঞানের আভাষই পাইয়াছিলেন। সেজন্যই প্রিয়নাথ আত্মজ্ঞানের আভাষ পাইয়াও প্রেমিক, ভগবৎ-ভক্ত। অথবা ভক্তি-তত্ত্বের উচ্চ সোপানে উন্নীত হইয়া সাধক যেমন পূজক ও পূজ্যে অভেদের আভাস পায়, প্রিয়নাথের আত্মাভাসও সেইভাবের ছিল। সাধকপ্রবর কবি পূজ্যপাদ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব 'ব্রহ্মময়ীর সকল ব্রহ্মময়'-শীর্ষক গানে লিখিয়াছেন—

"প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন,
তোমায় আমায় সাধন হয়!
(তখন) অভেদ সম্বন্ধে মাতি প্রেমানন্দে,
ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়!"—

প্রিয়নাথের আত্মজ্ঞানের আভাসও ঠিক ঐ ভাবের ছিল।

প্রিয়নাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত 'ছোট আমি' বা 'কাঁচা আমি' ত্যাগ করিয়া 'পাকা আমি' অবলম্বনে অবস্থান করিতে চিরযত্নশীল ছিলেন। জীবন-পরীক্ষা গ্রন্থের উপসংহারে তিনি জীবন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি?—প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—'ভগবদুপাসনা'। আবার মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া 'মনুষ্যত্ব'লাভই যে একমাত্র ভগবদুপাসনা—ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই মনুষ্যত্বলাভ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—(জীবন-পরীক্ষা, ৪র্থ প্রচার)

৩২৭ পৃষ্ঠা) "ভগবদুপাসনা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গভীরতম ব্যাপার। ভগবানের উপাসনা বা অর্চ্চনা করিতে হইলে প্রথমতঃ হৃদয়কে অনিত্য চিন্তাসমূহ হইতে বিরত ও প্রশান্ত ভাব সম্পন্ন করা বিশেষ প্রয়োজন; অনিত্য চিন্তা বিবর্জ্জিত, শান্ত মনের সাহায্যে, উপাসক যদি বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বরচনাপ্রণালী ও সৃষ্ট জীবসমূহের প্রতি অপরিসীম করুণার কথা আলোচনা করে তাহা হইলে এক অপূর্ব্ব ভাবামৃতের আস্বাদ পায়। এই ভাবরসামৃতই অনিত্য বিষয়ে বিরাগী করিয়া সনাতন শাশ্বত আনন্দ দানে ঈশ্বরাভিমুখে তাহাকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণ তাহাকে পবিত্র ও তাহার মোহাবরণ বিমুক্ত করত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করে।" প্রিয়নাথ বলেন এই জ্ঞান-সাহায্যেই ভেদজ্ঞান বা 'অসমদৃষ্টি' নাশ হইয়া উপাসককে সমদর্শী করিয়া তুলে; এবং "এতাদৃশ সমদৃষ্টিই" প্রিয়নাথ লিখিতেছেন,—"মানবশরীরধারী জন্তর অহঙ্কার বা দেহাত্মাভিমানকে ধ্বংস করিয়া প্রকৃত 'অহংজ্ঞান' বা 'আত্মজ্ঞান' প্রদান করে। এই অহং-জ্ঞানের অপর নাম 'মনুষ্যত্ব'। অর্থাৎ অহংজ্ঞান লাভ করিলেই মানব-শরীরধারী জীব প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হন; এবং স্বীয় মনুষ্যত্ব বা অহংজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বোহং (সমস্তই আমি) বা ব্রহ্মাহং (ব্রহ্মই আমি) বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশ্বেশ্বরের সহিত সমগ্র বিশ্বরাজ্যকেই একরূপে দর্শন এবং এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূজোপাসনা করিয়া থাকেন।—ইহারই নাম প্রকৃত 'ঈশ্বরোপাসনা'।" তবে একটা কথা, উপরি উক্ত ভাব সকল হইতে এ-কথা কেহ না বুঝেন যে প্রিয়নাথ মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। মিত্র-দেবালয়ে সর্ব্বদা বস-বাস, নানা তীর্থ ভ্রমণ ও তীর্থস্থ দেবদেবী-সমূহের পূজা-দর্শনাদি, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীমন্দিরে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত প্রভৃতি করিয়া তিনি মূর্ত্তি-পূজার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রিয়নাথের গৃহে অনেকগুলি দেবদেবী মূর্ত্তির ছবিও ছিল।

তিনি এই সকল ছবিকে বেশ সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিতেন ও পুষ্পমাল্যাদি দানে তাহাদের নিত্য শোভাবর্দ্ধন করিতেন।

পরিচ্ছন্নতা

প্রত্যেক বিষয়েই প্রিয়নাথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন ও যেখানে যে দ্রব্যটী রাখিলে গৃহের যথার্থ শোভা বর্দ্ধিত হইবে ও আবশ্যক মত কার্য্যে আসিবে সেটী সেই ভাবে ও সেই স্থানে রাখিতেন। সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন,—'গৃহ দেখে বুঝা যায় গৃহস্থ কেমন'—প্রিয়নাথের সেই ক্ষুদ্র সুসজ্জিত শান্তিপূর্ণ আবাস-গৃহে প্রবেশ করিলেই বেশ বুঝা যাইত যে, সেই গৃহবাসী ব্যক্তি কেমন প্রকৃতির লোক। প্রিয়নাথের বাসগৃহে তাঁহার বসিবার চৌকীর এক পার্শ্বে কয়েকটী প্রস্তরখণ্ড বা 'নুড়ি' সকল সময়েই সযত্নরক্ষিতভাবে দেখা যাইত। গৃহসংলগ্ন দেব দেবী মূর্ত্তির প্রতিকৃতিগুলিকে যেমন তিনি নিত্য পুষ্প বা পুষ্প-মাল্য দান করিতেন, তাঁহার সযত্ন সঞ্চিত ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলিকেও তদ্রূপ পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত রাখিতেন। উহা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন—'মহাশয়, এ নুড়িগুলিকে কেন অমন ভাবে রাখিয়াছেন?' প্রিয়নাথ অবশেষে বুঝিলেন যে, এই শিলাখণ্ড-গুলিকে এই ভাবে রাখিতে হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দান করা তাঁহার একটী নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে। অগত্যা তিনি একখানি সুন্দর আসন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূচী-কার্য্যে এই কবিতাটী লিখিয়া নুড়িগুলি সেই আসনে রাখিয়া দিলেন,—

"যে ভাবে যে জন মোরে করে দরশন,
সেইরূপে করি তার বাসনা পূরণ।
'শিলা' 'শিব' সবি আমি, যে করে প্রত্যয়,
নির্ম্মল মানসে তার না পশে সংশয়।"

প্রিয়নাথের রচিত 'আহ্নিক-ক্রিয়া' নামক পুস্তকখানি পাঠেও তাঁহার হৃদয়ের ঐ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; বুঝা যায় যে, তিনি "ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে। ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্॥" শ্লোকোক্ত ভাবের ভাবুক হইয়া সর্ব্বভূতেই সমভক্তিভাবে ভগবানকে পূজোপাসনাদি করিতেন।

গৃহী না সন্ন্যাসী

আমাদের আর একটী কথা বলিবার আছে। সে-টী প্রিয়নাথ সন্ন্যাসী কি সংসারী তাহা নির্ণয় করা। সাধু প্রিয়নাথ সদা সর্ব্বদা সংসার-বিরাগীর ন্যায় একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ও একখানি উত্তরীয় বা মোটা চাদরে গাত্র আবরণ করিয়া থাকিতেন, যথা সময়ে সংযতভাবে সামান্য আহারেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। দারুণ শীতে বা প্রাবৃটের ঝঞ্ঝাবাতে কখনও তিনি জামা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ব্যাধির জ্বালা নিরন্তর উপস্থিত থাকিয়াও তাঁহাকে কোনও রূপে অপরের সেবা-ভোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে রত থাকিয়া তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেন। অনেকে এই জন্য সময় সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"মহাশয়, আপনি কি সন্ন্যাসী?" শান্ত প্রিয়নাথ প্রফুল্ল মনে উত্তর দিতেন,—"মহাশয়! আমি সংসারী! সংসারের সেবাই আমার জীবন-ব্রত"। জীবনান্ত কালের অল্প দিন পূর্ব্বে প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগে তিনি পরিণীত হয়েন। অনেকে এই জন্য তাঁহাকে অনুযোগ করেন, শুনা গিয়াছে। কিন্তু মহাত্মা প্রিয়নাথ জানিতেন যে, "বিধিলিপি সত্যসত্যই অখণ্ডনীয়"। তাঁহার পরম শ্রদ্ধার্হা জননী ও ইষ্টমন্ত্রদাত্রী নিজ কনিষ্ঠ পুত্রগণের বিবাহ হইয়া যাইবার পর, 'প্রিয়নাথ বিবাহ না করিলে অনশনে দেহত্যাগ করিব'—এইরূপ ভীষণ সঙ্কল্প করেন।

সঙ্কল্প করিয়া প্রিয়নাথ-জননী 'মিত্র-দেবালয়ে' প্রিয়নাথের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং এক দশমী তিথির রাত্রে তাঁহার সহিত অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, "আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া এইখানে শয়ন করিলাম, যতক্ষণ না তুমি মুখে বলিবে—বিবাহ করিব—ততক্ষণ পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করিব না" ! নির্জ্জলা উপবাস করিয়া দশমী ও একাদশীর রাত্রি কাটিয়া গেল। দ্বাদশীর ঊষাকালে বিচলিত প্রিয়নাথ অনেক সাধ্য-সাধনা দ্বারা মাতাকে স্নানাহার করাইবার চেষ্টা করিলেন, বিনতি করিয়া বলিলেন, 'মা, এইরূপ শ্বাসব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় ও প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগে বিবাহ করিলে আমি আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব বলিয়া বোধ হয় না।' কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। মাতার দৃঢ় পণ—প্রিয়নাথ একবার মুখে বলিবেন, তিনি বিবাহ করিবেন। দ্বাদশীর দিবাভাগ অবসানপ্রায় দেখিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্পা অনশনক্লিষ্টা গর্ভধারিণীর নিদারুণ দুঃখোৎপত্তির কারণ হওয়া সুপুত্রের কর্ত্তব্য নহে বুঝিয়া প্রিয়নাথ মাতৃতৃপ্তির জন্য নানা সর্ত্ত উত্থাপন পূর্ব্বক বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই সকল অসম্ভব সর্ত্ত সম্ভব হইল এবং জীবনের শেষভাগে প্রিয়নাথ পরিণীত হইলেন! মাতৃআজ্ঞা-পালনরূপ মহাযজ্ঞের হোমানলে প্রিয়নাথ আপনাকে আহুতি প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর তিনি দুই বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন*, এবং সর্ব্বদাই বলিতেন—"বিধিলিপি অখণ্ডনীয়"। কিন্তু পরিণয়ে প্রিয়নাথের কিছুই আসিয়া যায় নাই। কুমার প্রিয়নাথ ও পরিণীত প্রিয়নাথকে আমরা একরূপই দেখিয়াছি। পরিণীত অবস্থা তাঁহার স্ত্রীর ভরণপোষণ রূপ আর একটি কর্ত্তব্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু বিবাহ করিয়া তিনি জনসাধারণের ন্যায় কামাশক্তির সেবা করেন

* ২৯শে আশ্বিন ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রিয়নাথের দেহান্তর হয়।

নাই, তাহা আমরা সবিশেষ জানি। বর্ত্তমান লেখক তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অন্যূন বিশ বৎসর কাল প্রিয়নাথের সহিত পরিচিত ছিল। তথাপি মহাত্মা প্রিয়নাথের মহাপ্রাণতা সম্যক্ উপলব্ধি করার অভিমান সে রাখে না। তাঁহার পূত চরিত্রের সংক্ষেপ পরিচয় এইরূপে দিতে বসিয়া সে ভাবিতেছে, 'শিব গড়িতে বাঁদর গড়িতেছে' কি না! কালের প্রভাবে হয়ত আমরা প্রিয়নাথকে বিস্মৃত হইব, কিন্তু তাঁহার অমূল্য তত্ত্বোপদেশপূর্ণ গ্রন্থরাজি বাঙ্গালী পাঠকগণের স্মৃতি-মন্দিরে তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। নীরবে, নিভৃতে এই দীন ভূদেবতনয় আমাদের জন্য—মদ খাও নেশা ছুটিবে না, আনন্দতুফান, জীবন-পরীক্ষা, আহ্নিক ক্রিয়া, কুমাররঞ্জন, জীবনকুমার, ও দুঃখীর ইতিহাস বা জীবন্ত-পিতৃদায়, প্রভৃতি যে সকল সাহিত্য-কুসুম রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। সচন্দন তুলসী-বিল্বপত্র-জবাদি যেমন শ্রীভগবানের পূজায় প্রযুক্ত হইয়া নির্ম্মাল্যরূপে ভক্ত সাধকগণের শিরঃশোভনকারী হয়, বীণাপাণির অর্চ্চনায় উৎসর্গীকৃত ভিখারী প্রিয়নাথের মধু-গন্ধ-কান্তি-বিশিষ্ট এই সকল সাহিত্যকুসুমও তদ্রূপ ভক্তি ও তত্ত্ব-পিপাসু পাঠকবর্গের মনে ভাবরসামৃত ঢালিয়া তাহাদিগের নিকট চিরকাল অমূল্য রত্নরূপে পরিগণিত থাকিবে। *

* প্রিয়নাথের স্মৃতিসভা উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র *

জানি না শ্রীভগবানের কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমাদের এই বাগবাজার পল্লী ক্রমান্বয়ে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি নানা আধিদৈবিক উৎপাতে পীড়িতা হইতেছে। দীনা নিরাভরণা পল্লী-জননীর যে দুই চারিখানি মাত্র অলঙ্কারও ছিল তাহাও একে একে কাল-তরঙ্গের করায়ত্ত হইল। সে বৎসর বাগবাজার-গৌরব, ভারত-বিশ্রুত, গৌরগতপ্রাণ, সম্পাদককুলচূড়া শিশিরকুমার আমাদের কাঁদাইয়া গিয়াছেন! তারপর আর একটী বিদেশীয় অত্যুজ্জ্বলরত্ন, যাহা বহু তপস্যায় আমাদের সৌভাগ্যে বাগবাজারের অঙ্কগত হইয়াছিল,—যাঁহার প্রভায় সমগ্র ভারতবর্ষও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মহামহিমশালিনী, দরিদ্র-জননী উচ্চহৃদয়া, ভগিনী নিবেদিতাও গত বৎসর অকস্মাৎ বাগবাজার পল্লীকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া অকালে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। আবার কয়েকমাস যাইতে না যাইতে যখন বাগবাজারের কোহিনুর মহাকবি গিরিশচন্দ্র গত বৎসর (প্রায় এই সময়েই) বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যাকাশ অন্ধকার করিয়া 'দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত' বঙ্গের নবীন নাট্যশালার 'রবাব-বীণা-মুরজ-মুরলী' চিরদিনের মত নীরব করিয়া ত্রিদিব প্রয়াণ করিলেন, তখন মনে হইয়াছিল এবার বুঝি দুঃখনিশার

---

* ৮ রায় নন্দলাল বসুর ভবনে গত ১৭ই চৈত্র, ১৩১৯ রবিবার, ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতি-শোক সভায় পঠিত ও ২৮এ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত। সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ মহোদয়।

অবসান হইল। আর বোধ হয় আমাদের এরূপ ভাবে শোকাশ্রু মোচন করিতে হইবে না। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! আঁধার ঘরের নিভৃত কোণে সঙ্গোপনে লুক্কায়িত, সযত্নে রক্ষিত একমাত্র ক্ষুদ্র রত্ন, যাহা 'শিবরাত্রির সল্‌তে'র মত এই পল্লীর একমাত্র ভরসার স্থল হইয়া উঠিতেছিল— যাহাকে দ্রুত ও দৃঢ় পাদবিক্ষেপে উন্নত হইতে দেখিয়া পল্লীবাসীর ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছিল, সেই কান্তমধুরোজ্জলদীপ্তিদায়ক বাগবাজার পল্লীর 'শেষসর্ব্বস্ব' মহামতি ডাক্তার গণেন্দ্রনাথকেও আমাদের বক্ষো বিদারণ করিয়া গ্রহণ করিতে—হে নির্ম্মম কাল—তোমার হৃদয়ে কি দয়ার লেশমাত্রও সঞ্চারিত হইল না? তাই বলিতেছিলাম, জানি না কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিবার জন্য শ্রীভগবানের এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা হইল। সে-দিন প্রাতে শুনিলাম, গণেন ডাক্তার 'মোটার গাড়ী' করিয়া অজানা প্রদেশে চিকিৎসার্থ চিরজীবনের জন্য চলিয়া গিয়াছে! বোধ হয়, তাহাই হইবে। হয়ত বা দেব-লোকে কোনও কারণে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের একজনের অভাব ঘটায় এই দেবোপম ভিষক-চূড়ামণির উপস্থিতির আবশ্যকতা ঘটিয়াছে!

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ এ পল্লীর কে ছিল ও কি ছিল—তাহা অত্রকার এই বিরাট জনসঙ্ঘ, এই মহতী শোক-সভা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গণেন্দ্রনাথ! তুমিই ধন্য! তুমি অকালে অন্তর্দ্ধান করিলে বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, চক্ষের অন্তরাল হইলে মনের অন্তরাল হয়—এ প্রবাদ বাক্যটি তোমার জন্য উল্টাইয়া যাইবে। তুমি মরিয়া যথার্থই অমর হইয়াছ!

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চির স্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে?"

কবিবর মধুস্থদন গাহিয়াছিলেন বটে, আবার তিনিই বলিয়াছিলেন,—

"কিন্তু যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে স্থবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে !"

ভাই গণেন্দ্রনাথ, তুমিই সেই মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরতে—তুমি আমাদের মানস-সরোবরের স্মৃতি-জলে চিরকাল ফুটিয়া থাকিবে !

তাই আজ তোমার জন্য এই শোক সভায় কে না আসিয়াছেন ? তোমার পিতৃ-বন্ধুগণ—তোমার নিজ বন্ধুগণ—তোমার শিক্ষকগণ—তোমার ছাত্রগণ—তোমার গুণমুগ্ধ-জনগণ—এমন কি তোমার পুত্রস্থানীয় বালকগণও আজ এই মহতী শোক-সভায় মিলিত হইয়া শোকাশ্রুর সহিত প্রাণের গভীর বেদনা জানাইতেছে। তাই বলিতেছি, তুমি মরিয়াই অমর হইয়াছ ! তোমার লোক-হিতৈষণা কীর্ত্তি তোমায় চিরজীবি করিয়া রাখিবে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

শিক্ষা-মন্দিরে

প্রায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিট্যান ইনিষ্টিটিউসনের শ্যামপুকুর শাখায় বাল্যজীবনে অধ্যয়নকালে আমরা শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত; প্রতিবেশী ও একই-বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃযুগল আমাদের উপরের শ্রেণীতে ও তিনি আমাদের নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া একত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এক এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৯৪।৯৫ খৃষ্টাব্দ এই দুই বৎসর ধরিয়া একত্র অধ্যয়নকালে শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। আজও সে সুখ-স্মৃতি আমাদের মনে জাগরূক রহিয়াছে! শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ এত সরল প্রকৃতির ও এত সরল অন্তঃকরণের লোক ছিলেন যে, তিনি পারিবারিক ঘটনাদির কথা, এমন কি প্রতি দিবস নবপরিণীত-সহধর্ম্মিণীর সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইত তাহাও অসঙ্কোচে, অবশ্য সুহৃদ্‌জ্ঞানে আমাদের নিকট বলিয়া আনন্দলাভ করিতেন! কিন্তু বাহিরে, অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধু-ব্যতীত অন্যান্য সহপাঠিগণের নিকট গণেন্দ্রনাথ চিরগম্ভীর—তাঁহার কান্ত-মধুর সদা-মৃদু-হাস্য-যুক্ত-প্রশান্ত-বদন, বিনয়নম্রবিমলস্বভাব, বালকসুলভসরলতা এবং সত্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা আজও আমাদের মনে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

চিকিৎসক

বহুকাল পরে আমরা সংসার-ক্ষেত্রে নামিয়া যখন পুনরায় মিলিত হই, তখন গণেন্দ্রনাথ ভিষককুলভূষণ এবং আমরাও স্বাস্থ্যহীন রোগিগণের অগ্রগণ্য! এ সম্পর্ক আরও মধুর। বাল্যের সেই বন্ধুত্ব যেন আরও ঘনীভূত হইয়া শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথকে আমাদের চিরহিতৈষী, রোগে শান্তিদাতা, পরম বান্ধবরূপে আমাদের সাহায্যের জন্য বিধাতা প্রেরণ করিলেন।

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথের চিকিৎসা-বিদ্যায় অত্যদ্ভুত পারদর্শিতা—চিকিৎসা বিদ্যা ও শাস্ত্রের সকল বিষয়ে তাহার পূর্ণ অভিজ্ঞতা, পরীক্ষাসমূহে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারের কথা ও সুবর্ণ-পদকাদি ও বৃত্তি লাভের কথা এবং তিনটী বিষয়ে একত্র এম্ ডি পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার অভূতপূর্ব্ব কথা তাঁহার সহাধ্যায়ী বান্ধবগণ ও তাহার অধ্যাপকগণ আজ চারিদিকে উচ্চ

নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন। যখন অভিজ্ঞগণ শত-মুখে তাঁহার যশোগান গাহিয়াও আজ তৃপ্ত নহেন, তখন সে সকল কথা আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞজনের আলোচ্য নহে—তবে আমরা যাহা জানি ও বুঝিয়াছি তাহাই মোটামুটি দু'এক কথায় অতঃপর বলিতেছি।

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথের চিকিৎসার যশো গাথা আজ বাগবাজার পল্লীতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত। ডাক্তার হিসাবে তাঁহার নাম বহু দিবসাবধি এ অঞ্চলে প্রতি গৃহে-মুখরিত হইত। এ পল্লীর বালক, যুবক, বৃদ্ধ, কন্যা ও জননীগণের প্রত্যেকের মুখেই গণেন ডাক্তারের চিকিৎসার সুখ্যাতির কথা, রোগিগণের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ সহানুভূতির কথা, রোগ-মুক্তকরণে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা আজ প্রতিধ্বনিত। গণেন্দ্র-নাথ বাঙ্গালীর বাঙ্গালী, গণেন্দ্র বিলাত প্রত্যাগত নহে, গণেন্দ্র সাহেব নহে, তবুও এক কথায় আমাদের পল্লীতে গণেন্দ্রই সাহেব ডাক্তারের স্থান অধিকার করিয়া এই কয়েক বৎসর ধরিয়া পল্লীবাসিগণের দেহের আময় হরণ করিতেছিল। এক কথায় গণেন্দ্রনাথ "রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া" দান করিয়া বিরাজিত ছিলেন। অক্ষম ব্যক্তি, দরিদ্র ব্যক্তি, অসমর্থ ব্যক্তি কত শত যে আজ তাহার অভাবে এমন শ্রেষ্ঠ সহায়-বিহীন হইল—কতশত দরিদ্র আতুর যে আজ পিতৃমাতৃহীনবৎ হইল, কত সাধারণ গৃহস্থও যে আজ এমন একজন ভিষককুলচূড়ার সুলভ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল—সে কথা কে বলিবে ?

লৌকিকতায়

গণেন ডাক্তারের সেই অসাধারণ সাম্যভাব, সেই দীনদরিদ্র ও উচ্চ ধনীর প্রতি সমান যত্ন, সমান আদর, সমান চিকিৎসা সাহায্য দান—আজ-কাল আর কোথায় দেখা যায় ? এ পল্লীর প্রত্যেক ভবনে, এ পল্লীর প্রত্যেক

কুটীরে ডাক্তার গণেন্দ্রনাথের নাম আজ হাহাকার ধ্বনির সহিত মুখরিত। ডাক্তার অনেক ছিলেন ও আছেন,—তাঁহাদের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে · তবে আমরা একথা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, যুবক ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ কি শস্ত্র-বিদ্যায়, কি ভৈষজ্য-বিদ্যায়, যে অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্য আয়ত্ত্ব করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসা-কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া এই অল্পকালের মধ্যেই যে যশ, যে সুখ্যাতি, যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাহা অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বৈদ্যের ভাগ্যেও ঘটে নাই। তদুপরি তাহার লোকহিতৈষণা, তাহার দরিদ্র-বাৎসল্য, প্রাণপাতী পরিশ্রমে তাহার চিকিৎসা-সাহায্য দানের কথা এ পল্লীতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যশঃ ও অর্থ ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ সমান ভাবে অর্জ্জন করিয়াছিলন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থের বিশিষ্ট অংশ চিকিৎসা সাহাব্য-দানে ও দরিদ্র ছাত্রগণের অভাব-অভিযোগাদি মোচনে ব্যয়িত হইত। শত শত আর্ত্ত-বিপন্ন প্রত্যহ তাহার সাহাষ্য পাইত। আমরা জানি, গণেন্দ্রনাথের লোকহিতৈষণা, গণেন্দ্রনাথের দরিদ্র-সেবার উদ্দেশ্য খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের জন্য নহে—উহা তাহার কর্ত্তব্যেরই অঙ্গীভূত ছিল। গণেন্দ্রনাথ বুঝিতেছেন পরোপকার পুণ্য নহে—কর্ত্তব্য। কায়মনোবাক্যে গণেন্দ্রনাথ স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে অনুরক্ত ছিলেন।

শেষ কথা

আমরা যতদূর জানি ডাক্তার গণেন্দ্রনাথের উচ্চ শিক্ষা, গণেন্দ্রনাথের ধন-মান-খ্যাতি তাহাকে অহঙ্কারী, দাম্ভিক ও নাস্তিক না করিয়া, তাহাকে বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী করিয়াছিল। আমরা জানি, ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মানব শক্তির অকিঞ্চিৎকরতা ও ঈশ্বর শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে অবহিত ছিলেন; কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন

আমাদিগকে বলেন যে মানুষ ডাক্তারেরা 'ঈশ্বরের শাসন-রূপ' রোগ সমূহের যতই প্রতিকার বিধানে সমর্থ হউক না কেন—তাঁহার ভাণ্ডার এখনও নূতন নূতন ঐরূপ 'লোক-শাসনী-শক্তির বিধানে পরিপূর্ণ—কলেরা বসন্তের টীকা আবিষ্কারের পর প্লেগ—প্লেগের টীকার পর—বেরি-বেরির সৃষ্টি। ক্ষুদ্র মানব—তোমার শক্তি সীমাবদ্ধ। ঈশ্বর-শক্তি অপরিমেয়। গণেন্দ্রনাথ জানিতেন মানুষ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইলেই যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইল। আমাদের সহিত শেষ-সাক্ষাতে ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ 'গীতার' সেই মহাশিক্ষাটি কাগজে লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ কর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা কখনও রাখেন নাই বলিয়া বা কর্ম্মফল 'তাঁহাকে' অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়াই কর্ম্মে এতটা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যদি আপনারা ডাক্তার গণেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষারূপ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট এ অধীনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনারাও যেন এই শুভকর্ম্মে ডাক্তারের ন্যায়—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—"

এই মহাশিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অগ্রসর হয়েন। তাহা হইলে ভরসা হয় আপনারাও মহামতি ডাক্তার গণেন্দ্রনাথের ন্যায় সিদ্ধকাম ও পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারিবেন।

বিসর্জ্জন *

"বিজয়া-বিকালে সোণার প্রতিমা
তুলে তুলে জলে ডুবিছে যেন !"

বাঙ্গালা গীতিকাব্য লেখকগণের শিরোমণি, 'সারদা-মঙ্গল', 'বঙ্গসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য-প্রণেতা কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন গীতি-ছন্দে উপরি উক্ত কবিতাটী গাহিয়াছিলেন। এই কাব্য-পঙ্‌ক্তি দুটীতে না জানি কি এক মহান্ উদার করুণ সুর আছে তাহা লিখিয়া জানান এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, কবিতা-বর্ণিত ঘটনাচিত্রের অনুভূতিতে যে সুর—যে করুণা—প্রাণের গভীরতম দেশের দারুণ মর্ম্মান্তিক যে অভিব্যক্তি আছে—তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই! উহা হৃদয়ে স্পন্দিত হয়, মন অনুভব করে এবং প্রাণই একমাত্র বোঝে। যথার্থই এই শস্য-শ্যামল বঙ্গে শরৎকালের সেই জগত্তারিণী রাজরাজ্যেশ্বরী গণেশ-জননী গিরিশ-জায়ার মৃন্ময়-আধারে চিন্ময়ী দেবীর দিবসত্রয়ব্যাপিনী মহা-পূজান্তে, সেই চতুর্যু্গ-বিখ্যাতা ৺শ্রীবিজয়া-দশমীর বিকালে, সেই অশেষ শ্রদ্ধার, সেই মহাপূজার, সেই পরম আদরের সামগ্রী সেই আয়তলোচনা, হাস্যাননা, দশ-প্রহরণ-ধারিণী, সন্তান-সন্ততি-পরিবৃতা, লাবণ্যোজ্জ্বলা, মহতী দেবী-প্রতিমার বিসর্জ্জন যে কেহ একবার মাত্র দেখিয়াছে, সেই বুঝিবে যে এই মহাকবি তাঁহার স্বর্ণতুলিকার একটী টানে সেই মহাদৃশ্যের কেমন সুন্দর একখানি ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন! কিন্তু ইহা কেবল কবি-বর্ণনা মাত্র নহে। সে দিন কলিকাতাস্থ বাগবাজার পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই

* উদ্বোধন—১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২৩

শোক-চিত্রের এক বাস্তব দৃশ্য দেখিয়া কি বিষম মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিয়াছিল—তাহা বর্ণনাতীত। তবে এ দিন বিজয়া দশমী নহে, বিজয়া বটে; এবং ভক্তের কাছে, এ-দিনও যে সমান আদরের ও স্মরণের দিন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সে-দিন সবে মাত্র কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদী তিথি আগমন করিতেছে—পূর্ব্বরাত্রে দীপান্বিতার নিবিড় আঁধার সমাচ্ছন্না বিষম অগ্ন্যুৎপাত-শব্দময়ী মহা অমাবস্যায়, সেই অনাদ্যা ব্রহ্ম সনাতনীর আদ্যামূর্ত্তি শ্যামার—বঙ্গের চির উপাস্যা, গভীর আঁধারোজ্জ্বলা, মহাভীমা, মহাক্ষেমা, জগজ্জননী মহাদেবী কালিকার প্রতিমা-পূজা সমাপন হইয়াছে। পর দিবস বিকালে যখন চির প্রথানুযায়ী কলিকাতাবাসী ভক্তগণ সেই মহাশ্যামা-প্রতিমার বিসর্জ্জন-মানসে দলে দলে জাহ্নবী-পুলিনাভিমুখে বাদ্যভাণ্ড নিনাদিত করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে—তখন কয়েকখানি দেবী প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে বাগবাজার পল্লীর এক মহীয়সী সাধ্বীর মৃতদেহ শ্মশান-বাসিনী শ্যামার সঙ্গিনীরূপে ত্রিতাপহারিণী গঙ্গার উপকূলে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। পল্লীস্থ বর্ত্মের সারি সারি অট্টালিকাগুলির ছাদে, অলিন্দায়, গবাক্ষে, দ্বার সমূহে, সর্ব্বত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা দণ্ডায়মান থাকিয়া সাগ্রহে সাশ্রুনয়নে সেই বহুগুণ সম্পন্না, বর্ত্তমান নারীকুলের অনুকরণীয়চরিত্রা শ্রীমতী নগেন্দ্র নন্দিনী ঘোষের শ্যামাপদ-লীন চিরনিদ্রাবৃত জড়দেহ দেখিয়া মহা আক্ষেপ করিতেছিল।

উদ্বোধনের প্রিয় পাঠকমণ্ডলীকে এই ধন্যা নারীর—যাঁহাকে গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ নারী বলা যাইতে পারে—অন্ততঃ দু একটা কথা শুনান আবশ্যক বোধে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। কারণ যতদূর স্মরণ হয় এই নারীরত্নশোভিতা ক্ষুদ্র অট্টালিকার কোন গৃহ বিশেষেই এই উদ্বোধন পত্রের জন্ম-কথা সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা, নানা উদ্যোগ আয়োজনের অনুষ্ঠান আলোচনা হইয়াছিল। উদ্বোধন-প্রতিষ্ঠাতা, উদ্বোধন-

সম্পাদক পূজ্যপাদ পুণ্যকীর্ত্তি স্বর্গীয় ত্রিগুণাতীত স্বামী এই বাটীতে বহুদিন এই আদর্শ ঘোষ-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া উদ্বোধন-প্রকাশের সুব্যবস্থা করিয়া স্থানান্তরে কার্য্যালয় স্থাপন করেন।

স্বর্গীয়া নগেন্দ্রনন্দিনী কলিকাতা করপোরেসনের Analyst ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ এম্, বি, মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। শশীবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণাশ্রিত কৃপাপ্রাপ্ত একজন ভক্ত। শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনীর সৌভাগ্যেই এমন স্বামী লাভ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই এবং সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার সহজাত সদ্‌গুণরাশি ফুটিয়া উঠিয়া লোক-সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হইবার সুবিধা পাইয়াছিল। আমরা জানি আমাদের নারী-সমাজে এখনও অনেক উন্নতহৃদয়া মহিলা আছেন যাঁহাদের এরূপ সুযোগ, এরূপ সাহচর্য্য মিলিলে আলোচ্যা সাধ্বীর ন্যায় তাঁহারাও আপনাপন জীবন গঠন করিতে পারেন। কিন্তু বিধাতার বিধান সর্ব্বত্র সমান নহে বলিয়া এইরূপ আদর্শ-চরিত্রা আজকাল বিরল।

স্বর্গীয়া ঘোষ-জায়ার কথা সংক্ষেপে লেখা যায় না, কারণ, তিনি যে বিবিধ সদ্‌গুণরাশির আধার ছিলেন তাহার আলোচনা সংক্ষেপে বলিলে ভাল করিয়া বলা হয় না। আমরা দুই চারি কথায় তাঁহার জীবন-চিত্রের আভাষ মাত্র দিলাম। এই আদর্শ-গৃহিণী সন্তান সন্ততি পালন করিতেন—শুধু লালন পালন করিতেন এরূপ নহে, সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামী সেবা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। গৃহের অন্যান্য যে সকল অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম তাহাও সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতেন। দেবমন্দির মার্জ্জন তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান স্বহস্তে করিতেন। এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াও আবশ্যকমত নিজ শরীরের প্রতি সামান্য ভাবে কর্ত্তব্য পালনে ক্রুটী না করিয়া স্বীয় পরিবারস্থ সকলের নানা-বিষয়িণী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সঙ্গে পল্লী ও সমাজের সেবা

করিবারও যথেষ্ট অবসর পাইতেন। যে তাঁহাকে না দেখিয়াছে, যে তাঁহার কথা না শুনিয়াছে—সে বলিতে পারিবে না যে কেমন করিয়া তিনি সংসারের সকল পরিচর্য্যা সম্যক্‌রূপে সংসাধিত করিয়াও বহুবিধ শিল্পকার্য্য করিবার সুযোগ ও অবসর পাইতেন। পাচিকা থাকিলেও নিত্যই কোন না কোন খাদ্যব্যঞ্জন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া স্বামী, পুত্র কন্যাগণ, এমন কি অতিথি অভ্যাগতগণের সাধ্যমত সেবা না করিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না। আমরা জানি দোকানের প্রস্তুত জলখাবার প্রভৃতি বিষ-লড্ডুক তুল্য আহারীয় দ্রব্যাদি কখনও তাঁহার গৃহে প্রবেশাধিকার পায় নাই। স্বীয় হস্তে গো-সেবা করিয়া গৃহজাত দুগ্ধ হইতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়াও সকলকেই খাওয়াইতেন—এবং সেই সঙ্গে কন্যাগণকে, পুত্রবধূকে এমন কি প্রতিবেশী সকলকে এই সকল খাদ্য-দ্রব্যাদি কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা দিতেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাহারাও বোধ হয় তাহাদের স্বর্গীয়া শিক্ষয়িত্রীর সদ্‌গুণরাশির কিছু কিছু অংশ লাভ করিয়াছে। শুধু আহার্য্য বস্তু নহে নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম—সৌখীন ভাবে দু-একটা কমফর্টার বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুএক জোড়া জুতা বা মোজা বোনা নহে—বাড়ীতে ব্যবহারের সমস্ত বিছানার সাজ, ছোট বড় জামা, সেমিজ, সায়া, ইজের, প্যাণ্ট, তক্তের ঢাকা, সাদা সূতার কাজ—পশমী সূতার কাজ, রেশমী সূতার এমন কি বহুমূল্য সাচ্চা জরির নানাবিধ শিল্পকার্য্য সদা সর্ব্বদা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন এবং সেই সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতিবেশিনীগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বাসবাটীতে যিনি একবার মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন তিনি লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারেন নাই যে, বাটীর সর্ব্বত্রই কি সমানভাবে সুপরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত, ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি কি সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত এবং গৃহকর্ম্মগুলি নিজের দ্বারা, সন্তানসন্ততিগণের দ্বারা ও দাস দাসীগণের দ্বারা কেমন যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত। যেন কাহারও কোন

অভাব নাই। কাহাকে কোন জিনিসের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। যেখানে যাহার যেটী আবশ্যক সেখানে সেটী যেন তাহার হাতের কাছে যোগান রহিয়াছে। স্বামী জানেন না আজ তাঁহাকে কি আহার করিতে হইবে, জানেন না আজ তাঁহাকে কি পোষাক পরিতে হইবে, জানেন না আজ কোথায় কি আবশ্যক আছে—সকল বিষয়েই উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। উনি সব জানেন। জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষাই কি গৃহিণী রাখিতেন? তাঁহাদের চোখের সাম্‌নে তাঁহাদের মুখের কথা খসাইতে না খসাইতে, তাঁহাদের হাতের কাছে সকল প্রার্থনীয় বিষয় প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত রহিয়াছে। স্বামীর উপার্জ্জনের মধ্যে যতটা হওয়া উচিত ততটা—এবং আমি বলি তাহা অপেক্ষাও কিছু বেশী—সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য গৃহে সদাই বিরাজমান। তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে—বর্ত্তমান কালোপযোগী এই আদর্শ গৃহিণীর গৃহিণীপনা মাত্র। 'নষ্ট নাই,—অভাব নাই,'—এই পরিবারের মূলমন্ত্র ছিল। কৃপণতা নাই,—বিলাসিতার ফেলাছড়া নাই। এক কথায়, ইচ্ছামত তুলিকা, রঙ ও চিত্র শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না পাইলেও নিপুণ, চতুর চিত্রকর যেমন স্বীয় সংগৃহীত সামান্য উপাদানে মনোমতভাবে আপনার চিত্রে চিত্রকলার সৌন্দর্য্য সাধ্যমত সমাবেশ করিতে বিরত হয় না,—নিপুণ যন্ত্র-শিল্পী যেমন সময়ে সময়ে ভগ্ন যন্ত্রটীও আবশ্যকমত সংস্কার করিয়া তদ্দ্বারা সুন্দর সুন্দর কার্য্যের সৃষ্টি করে—সেইরূপ এই আলোচ্য গৃহিণী আপন গৃহটী উৎকৃষ্ট চিত্রের মত, উৎকৃষ্ট যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা সুসংস্কৃত রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন-কালের সেই কথা—যদিও কেহ কেহ মিষ্টভাবে কিছু শ্লেষের সহিত উল্লেখ করেন—"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—এই ঘোষ-পরিবারের হিসাবে অতি সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছিল। ঘোষ-গৃহিণী শুধু শিল্পনিপুণা, শুধু কর্ম্মকুশলা এবং শুধু পটু গৃহিণী ছিলেন এমন নহে—তাঁহার মধুর ব্যবহার, তাঁহার সরল-

প্রকৃতি, তাঁহার সুমিষ্ট আলাপ, তাঁহার নানা বিষয়ে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা, তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও নারী হইয়াও সকল বিষয়ে তাঁহার হিসাব-বুদ্ধির ও পুরুষোচিত আত্ম-নির্ভরতার, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-নির্ভরতার এবং সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া পরিবারস্থ সকলে, এমন কি প্রতিবেশিগণও মুগ্ধ ছিলেন।

এ-দিকে পারিবারিক জীবন ব্যতীত এই আদর্শ গৃহিণীর একটা সামাজিক জীবনও ছিল। নিজ পরিবারবর্গের জন্য সাংসারিক আয়-ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন তিনি নারিকেল তৈলের বিশুদ্ধতা-সম্পাদন করিবার কল-কারখানা চালাইয়া ঐ ব্যবসায়ে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেইমত পল্লীস্থ কয়েকটী সহায়হীনা মহিলাদের জন্য মোজার কল, সেলাইয়ের কল যোগাড় করিয়া তাঁহাদিগকে শিল্প-কার্য্যে অর্থোপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের কথঞ্চিৎ আয়ের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী সিষ্টার নিবেদিতা যখন তাঁহার বাগবাজার বসুপাড়াস্থ 'স্ত্রী-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিয়া বড় বড় মেয়েদের জন্য শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তখন ইনিই অগ্রণী হইয়া পল্লীস্থ নারীগণের উক্ত কার্য্য শিক্ষাকল্পে অনেক সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এইরূপ একজন মধ্যবর্ত্তী লোক হিন্দুকুল-বধূশ্রেণী হইতে না পাইলে সেই উচ্চহৃদয়া সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-মহিলা আমাদের সমাজের অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণের উপকারে কতটা আসিতেন বলা দুষ্কর। তিনি নিজে শিল্প বুঝিতেন, বুঝিয়া লইতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। দয়াময়ী সিষ্টার ইঁহার কার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া, ইঁহার সুশিক্ষিত মনের পরিচয় পাইয়া ইঁহার স্বামীকে কতবারই না বলিয়াছেন—"Dr. Shashi, your wife is one in a million !"—অর্থাৎ তোমার সহধর্ম্মিণী অসামান্যা—লক্ষের মধ্যে একজন বলিলেও হয়। আমরা জানি যে তাঁহার সাহচর্য্যে ও শিক্ষায়

ঐ বিদ্যালয়ের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। এবং কয়েকজন সহায়হীনা হিন্দু-মহিলা ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে ঘোষ-গৃহিণীর বিশেষ সাহায্য পাইয়া শিল্প-কার্য্যের সহায়ে আপনাপন জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া লইয়াছেন।

উপরোক্ত জীবন-চিত্র দেখিয়া কেহ কেহ এইরূপ না মনে করেন যে, আলোচ্যা ঘোষ-গৃহিণী আজকালকার নব্য-সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিতা নারীর ন্যায় ছিলেন মাত্র। কেহ না বলিয়া উঠেন,—আজ কাল ঐ সকল কার্য্য ত প্রায় অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি একদিক রাখিতে আর একদিক হারাইয়া বসেন না—অর্থাৎ আমাদের প্রাচ্য আদর্শ হইতে বিচ্যুতা হইয়া পড়েন না? অল্পে বলিলেই চলিবে যে, তাঁহাদের সে অনুমান মিথ্যা—কারণ প্রাচ্য আদর্শ অনুযায়ী 'ষষ্ঠী-মাকাল' পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বারব্রতরক্ষা, অতিথি-অভ্যাগত-সেবা প্রভৃতি যাহা যাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয় এবং সাধ্য তাহার কোন অনুষ্ঠানেরও ত্রুটী এই পরিবারে ছিল না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশপ্রথানুযায়ী শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা দিবসের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থায় কিছুতেই গোল না হয় ও ঐ পূজাটি স্থানান্তরে যেন না হয়—কারণ তাঁহার স্বামী এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া উহা অন্যত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মৃত্যুশয্যায়ও তাঁহার সে হুঁস ছিল এবং তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর যথার্থই সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধাসম্পন্না ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণের ও পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্যা মনে করিতেন। গত রথ-যাত্রা উপলক্ষ্যে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইয়া রথস্থ শ্রীশ্রীবামনদেবকে স্বীয় হস্তে প্রস্তুত নানা ভোগ উপচারে সেবা করিয়া তিনি না কি বলিয়াছিলেন যে, ইহাই আমার প্রথম তীর্থ-বিগ্রহ-সেবা এবং বোধ হয়, ইহাই আমার শেষ সেবা! বিস্ময়ের বিষয়, বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ন্তৃত্বের

অমোঘ ব্যবস্থায় তাঁহার এই কথাই রহিয়া গেল! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব একবার মাত্র সেবা গ্রহণ করিয়াই, মনে হয়, অচিরে লীলা-সঙ্গিনীকে শ্রীপদপ্রান্তে টানিয়া লইলেন! আবার এ-দিকে সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সমান শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যুগে তিনি আদর্শ গৃহিণী ছিলেন এবং আমাদের মনে হয় বিশ্বপ্রেমের অপূর্ব্ব স্বাদও তিনি পাইয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে—অল্প কথায় বলা যায় যে, তাঁহার এই অপূর্ব্ব জীবনাদর্শ উপভোগ করিতে পারিয়া তাঁহার পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্বাদিগণ যেমন গৌরবান্বিত ছিল, আমাদের এই পল্লী-সমাজেরও তিনি অমূল্য অদ্বিতীয় অলঙ্কারস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে যথার্থই আমরা মর্ম্মাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে! শ্রীভগবান্ শোকসন্তপ্ত সকলেরই হৃদয়-মন শান্ত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ!

দেশমান্য সারদাচরণ *

দেশের নক্ষত্রপাত হইয়াছে। বঙ্গদেশের মহামহীরুহ পতিত হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, বড় দুর্ভাগ্যের কথা—দেশমান্য স্বনামধন্য, মহাকর্ম্মবীর, প্রতিভার অবতার মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র গত মঙ্গলবার, ১৯এ ভাদ্র, (ইংরাজি ৪ঠা সেপ্টেম্বর) রাত্রি এগারটা পঁচিশ মিনিটের সময় সাধক হিন্দু-সন্তানের মত সজ্ঞানে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে জাহ্নবী-জীবনে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বিদ্যা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, দেশভক্তি, স্বধর্ম্মানুরাগ, মাতৃভাষা-সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি এতগুলি সদ্‌গুণ একাধারে এত উজ্জ্বলভাবে প্রকট আর কোথাও দেখা যায় কি? আমরা তাঁহার জীবনের গোটাকয়েক প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখমাত্র করিতে এখানে চেষ্টা করিব।

সারদাচরণ ১৮৪৮ খৃঃ ১৯এ ডিসেম্বর হুগ্‌লি জেলাস্থ পানিসেহোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ঈশানচন্দ্র মিত্র ব্যবসায়ী ও সওদাগরী আপিষের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। উপর্য্যুপরি মাতৃবিয়োগে ও ভ্রাতৃবিয়োগে তিনি কাতর হন এবং স্বাস্থ্যহীন হয়েন। ১৮৫৮ খৃঃ কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া প্রতিবর্ষেই পরীক্ষায় নিজ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। এই সময়, ১৮৬২ খৃঃ, পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পুনরায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু ১৮৬৫ খৃঃ প্রবেশিকা

* মাধুরী, ১ম বর্ষ, ৪—৫ সংখ্যা, আশ্বিন—কার্ত্তিক, ১৩২৪।

পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি এফ-এ, বি-এ, এম·এ ও রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। এম-এ পরীক্ষায় তৃতীয়, অন্যান্য সকলটীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষা দিবার এক মাস পরে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া এক বৎসরেই দুটী ডিগ্রী পান। পরে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়া আইন-ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি করিতে থাকেন; এবং শেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতিপদে নিযুক্ত হয়েন এবং ১৯০৪ খৃঃ ঐ পদে পাকা হয়েন। বিচারক-হিসাবে তাঁহার অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিবার যোগ্য ব্যক্তি আমরা নই—তাহা সর্ব্বজনসমাদৃত এবং বিজ্ঞ বিচারকদল-প্রশংসিত।

মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দেশের যে দ্বিতীয় মহারত্ন আমরা হারাইয়াছি—সেই ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি একযোগে বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করেন ও ঐ সঙ্গে বিদ্যাপতির একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিছু কাল পরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সভাপতিরূপে তিনি যে ঐ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছেন—তাহাও দেশ-প্রসিদ্ধ। 'উৎকলে শ্রীচৈতন্য', 'পুরন্দর খাঁ', 'উমিচাঁদ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁহার মনীষা, অনুসন্ধিৎসা ও প্রতিভা দেদীপ্যমান।

স্বজাতির উন্নতি ও নানা সংস্কারের প্রবর্ত্তক হিসাবে তাঁহার নাম চিরোজ্জ্বল থাকিবে। তিনি স্বজাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত জ্ঞান করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাঢ়ে ও বঙ্গে আদান প্রদান করিয়া জাতিমধ্যস্থ ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি নিখিল ভারতের কায়স্থ জাতিকে একাসনে পান ও ভোজন করাইয়া জাতীয় একতার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় বহু ভাষা-ভাষিগণের মধ্যে 'এক-লিপি-বিস্তারের' চেষ্টা করিয়া একতা সাধনেও তিনি তৎপর হইয়াছিলেন।

সারদাবাবুর স্বধর্ম্মে প্রবলা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন এবং এই সকল নানাগুণেই তিনি 'ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলে'র প্রধান সচিবের পদে নির্ব্বাচিত হয়েন। অত উচ্চ বিদেশীয় শিক্ষা তাঁহাকে একটুও বিচলিত করে নাই।

তিনি জন্মভূমির প্রতি অসাধারণ প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন এবং দেশের সমৃদ্ধিসাধনে নানাভাবে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়ে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং এই সকলের বহু অনুষ্ঠানের তিনি উদ্যোগী ছিলেন।

এক কথায় সারদাচরণ প্রতিভার ও কর্ম্মের অবতার। দেশ-সেবায় ও মাতৃভাষানুরাগে অদ্বিতীয়, স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি-প্রীতিতে অননুকরণীয়—অর্থাৎ সারদাবাবুর তুলনা—সারদাবাবু। এ-হেন সারদচরণকে হারাইয়া দেশবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত—তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহার মত প্রকৃতিবিশিষ্ট স্বধর্ম্মনিরত, সুশিক্ষিত, নির্ভীক, উদারচেতা কর্ম্মবীর বাঙ্গালী আর একজন কবে দেশে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার স্মৃতিপূজা-সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নানা সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"সারদাচরণ একজন আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিয়াছি।" বর্ত্তমান লেখককে এই দেশ-মিত্র সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্নেহের ঋণ অপরিশোধনীয়। যে দেশে, যে জাতিমধ্যে সারদাচরণের ন্যায় আদর্শ মানুষ জন্মগ্রহণ করে—সে দেশ ও সে জাতি ধন্য!*

* লেখকের 'বন্দনা' কাব্যে 'সারদা-মঙ্গল' কবিতা পড়ুন।

ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক

ও

ইছাপুরের বসু-মল্লিক-বংশ *

বিগত রবিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ (ইং ৩০শে নবেম্বর, ১৯২৪) কায়স্থকুলগৌরব, ক্ষাত্র-মহিমা-পুনরুদ্ধার-প্রয়াসী, বাঙ্গালী সেনাদল-প্রবর্ত্তক, স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর মুখোজ্জ্বলকারী, চিকিৎসক-শিরোমণি, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহোদয় স্বজাতি ও স্বদেশবাসীকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার গৌরবান্বিত স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা' ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে (রবিবার, ২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ইং ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪) গভীর শোক-প্রকাশ করিয়াছেন ও তদীয় আত্মীয়গণের শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতিজ্ঞাপন করিয়াছেন। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক স্বদেশে ও বিদেশে বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া শেষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সবিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। তিনি লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল কলেজ হইতে সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে লণ্ডনের দুই-তিনটী বড় বড় হাসপাতালে 'স্থায়ী' চিকিৎসক-রূপে কার্য্য করিয়া বহুতর অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং শেষে দেশে ফিরিয়া আসেন। অল্পদিনেই তিনি তাঁহার অশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-রূপে পরিগণিত হন এবং Chest, Lungs ও Throat সম্বন্ধীয় রোগ-সমূহের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে থাকেন। বহু আশাহীন মৃত্যু-মুখে পতিত বা আশঙ্কিত, অন্যান্য চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগীকে তিনি অল্পদিনে সুচিকিৎসার গুণে নিরাময় করেন। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের ন্যায় তিনি অতি অল্পমাত্রায় ভেষজাদি ব্যবহার

---

* কায়স্থ-পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৩১।

করিতেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা বিশদ করিয়া বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই। কলিকাতাবাসী জাতি-নির্ব্বিশেষে অনেকেই তাঁহাকে চিকিৎসকরূপে পাইলে সুখী হইত। তিনি বিলাত-প্রত্যাগত হইয়াও হৃদয়ে খাঁটি স্বদেশী ছিলেন এবং হিন্দু-সন্তান বলিয়া আপনাকে পরিচয় করাইতে গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার হৃদয়-নিহিত হিন্দুজাতির মহত্ত্বের ভাব তাঁহাকে হিন্দুমতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্রহের সমক্ষে বসিয়া হিন্দুর প্রাজাপত্য বিবাহ পদ্ধতির অনুসরণে বিবাহিত করিতে বাধ্য করে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার-প্রবর কায়স্থকুলভূষণ দেশহিতৈষী স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ মহোদয়ের কন্যা। দেশে যাহাতে সুচিকিৎসা ও সেবা-পরিচর্য্যা জাতির নিজাধিকারে প্রবর্ত্তিত হয়, সে বিষয় তিনি বিশেষ চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। 'King's Hospital' নামক চিকিৎসা ও সেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমে তাঁহার উক্ত বাসনা ফলবতী করেন। শেষে ঐ Hospitalটী 'Calcutta Medical School' নামক প্রতিষ্ঠানটীর সহিত সংযোজিত হয়; এ সকল কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী যে কলিকাতা সহরে অনেক কার্য্য করিতেছে ও উহার উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইতেছে, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতে প্রতি বৎসরই জানা যায়। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান-প্রচারানুষ্ঠানদ্বারা জাতির যে উপকার সাধন করিয়াছেন, হয় ত আর একজন বঙ্গের কৃতি সন্তান-দ্বারা সেইরূপ কার্য্য অসম্ভব হইত না, কিন্তু তিনি আর একটী যে মহৎ কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া—আর একজন দেশমান্য একাধারে ভিষককুলশিরোমণি ও অস্ত্রোপচার-নৈপুণ্যে দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক কায়স্থকুলোজ্জ্বল স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ও কায়স্থকুলভূষণ অকালে

পরলোকগত পাইকপাড়ার রাজবংশধর বদান্য স্বর্গীয় রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে সহযোগীরূপে পাইয়াছিলেন—সেই কার্য্যের কথা উল্লেখ না করিলে ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় না।

কায়স্থের দ্বারা শাসিত—চাঁদ রায়, কেদার রায়, সীতারাম রায়, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের শৌর্য্য-বীর্য্যে গৌরবান্বিত বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান কালের ক্ষাত্রমহিমহীন কলঙ্কময়ী অবস্থার উচ্ছেদ-সাধন-প্রয়াসী হইয়া ডাক্তার শরৎকুমার বাঙ্গালীজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য, ক্ষাত্র-শৌর্য্যে গৌরবান্বিত করিবার উদ্দেশে বাঙ্গালী-সেনাদল-গঠন-প্রয়াসী হইয়া যে মহৎ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক হইয়া গেলেন—ইহাই নিজ জাতিকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

নিজ জাতিকে বহুদিনের আলস্য ত্যাগ করাইয়া, জাতীয় জীবনের কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভীষণ রণক্ষেত্রের নাম-মাত্র-আস্বাদ পাওয়াইবার জন্য বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে রণক্ষেত্রে সেচ্ছাসেবকরূপে 'Bengal Ambulance Corps' নামক সেবাব্রতধারী এক যুবক-সঙ্ঘ গঠন করেন। পরে বাঙ্গালীর শক্তির আরও উচ্চতর প্রকাশ প্রচার আবশ্যক-বোধে ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় বাঙ্গালী সেনাদল-গঠনের উদ্যোগ আরম্ভ করেন। উহাই ক্রমে Bengali Regiment নামক সেনাদলে পরিণত হয়। যুদ্ধাবসানে এই সেনাদল এক প্রকার লোপই পাইল। Indian Territorial Force সেনাদল-সংঘটনে যাহাতে নিজ জাতির ক্ষাত্র-শৌর্য্যাভিলাষী যুবকগণের স্থান হয়, তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে কর্ত্তৃপক্ষগণের মন্ত্রণা-সভায় ডাক্তার মল্লিক মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধনে নিয়োজিত ছিলেন। এই মন্ত্রণা-সভা হইতে অসুস্থ হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং দুই তিনদিনের মধ্যেই কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগে (বিগত রবিবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ) অকালে

মৃত্যুমুখে পতিত হন। বঙ্গীয় সেনাদল-গঠনের বহু প্রচেষ্টার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-বি-ই উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে সি-আই-ই (C. I. E.) বা স্যার (Sir) অর্থাৎ নাইটহুড (Knighthood) উপাধিভূষিত করিলেই উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হইত—হয় ত আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে ঐরূপ উপাধি তিনি লাভই করিতেন। কিন্তু আক্ষেপের কিছুই নাই। ডাক্তার শরৎ মল্লিক মহাশয়ের স্মৃতি বাঙ্গালী-জাতির হৃদয়ে চিরদিন পূজা পাইবে। আনন্দের কথা—বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের বাটীতে—বাগবাজার, লক্ষ্মী দত্ত লেনস্থ 'লক্ষ্মী-নিবাসে' শরৎকুমারের বাঙ্গালী সেনাদলের একটি শাখা দুই দিন আসেন ও শেষের দিনে সভার বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় (প্রবন্ধ-লেখক) কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া দত্ত-পরিবারকে ও পল্লীস্থ অনুরাগিজনগণকে আপ্যায়িত করেন। বেলুড় মঠের অধিনেতা শ্রীমৎ স্বামী (বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণলোকগত) ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এই আনন্দ-সম্মেলনে যোগদান করিয়া সেনাদলকে আশীর্ব্বাদ করেন। (ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ খৃঃ) উক্ত লক্ষ্মী-নিবাসের অধিবাসী দত্ত-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অসুস্থতাকালে নানা চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখাইয়া, তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃস্নেহাভিষিক্ত করিয়া ডাক্তার শরৎকুমার চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। শরৎ-কুমারের অকাল মৃত্যুতে তাঁহাদের মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে।

নিম্নে আমরা ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়ের বংশকারিকার পরিচয়-কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম—চব্বিশ পরগণা জেলার ইছাপুর নামক সুবিখ্যাত গ্রামের এই বসু-মল্লিক-বংশ সম্ভ্রান্ত ও বহু প্রসিদ্ধ। এই বংশে বহু শিক্ষিত ও কর্ম্মী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশ ডেপুটির বংশ নামে পরিচিত ছিল ও ইহাদের সুপারিশে অপরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে পারিত এরূপ প্রসিদ্ধিও ছিল।

চব্বিশ পরগণা ইছাপুরের বসু-মল্লিক-বংশ
কৃষ্ণরাম
রামরাম
বিজয়রাম
দর্পনারায়ণ
শিবপ্রসাদ
মদনমোহন
রাজনারায়ণ
দুর্গাচরণ
মধুসূদন
নবীনচন্দ্র
শ্যামাচরণ
কালীকিঙ্কর
বনমালী
শম্ভুচরণ
অভয়চরণ
গোবিন্দ
ঈশান
সীতানাথ
কলিকাতা, বাগবাজার-নিবাসী,
রায়বাহাদুর-উপাধিভূষিত
ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর
(জন্ম ১৮১২—১৮৮৯ মৃত্যু)
হরিদাস
৺প্রিয়নাথ
অমূল্যচরণ
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট
ও ডেপুটি কালেক্টর
(১৮৩৯-১৮৮৩)
৺সত্যেন্দ্রকুমার
অতুলচরণ
ব্যারিষ্টার
(১৮৪৪-১৮৮৮)
অবিনাশচরণ
ডেপু ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
(১৮৪৭-১৮৯২)
সরকারী উকীল, মুঙ্গের
(১৮৫০-১৮৮৩)
দেবেন্দ্রনাথ
ব্যারিষ্টার (মৃত্যু ১৯২৪)
অক্ষয়কুমার
ইম্‌টেণ্ডেণ্ট,
প্রেসিডেন্সি
আফিং গুদাম
হেমকুমার
রায়বাহাদুর
ডেপুটি পরে ম্যাজি-
ষ্ট্রেট ও কালেক্টর
নরেন্দ্রকুমার
ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
অব্‌ পুলিশ
চব্বিশ পরগণা
৺শচীন্দ্রকুমার
ইন্‌স্পেক্টার
অব্‌ পুলিশ
(মৃত্যু ১৯১৭)
অমিয়কুমার
নির্ম্মলকুমার
বিমলকুমার
সুধীরকুমার
প্রবীরকুমার
বসন্তকুমার
আই-সি-এস্, স্যার; নাইট;
অন্যতম, পরে প্রধান জজ,
পাটনা হাইকোর্ট
৺শরৎকুমার*
এম্‌-ডি, সি-বি-ই;
বাঙ্গালী-সেনাদল-প্রবর্ত্তক
(মৃত্যু—১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১,
ইং ৩০ নভেম্বর, ১৯২৪)
হেমন্তকুমার
ব্যারিষ্টার
কলিকাতা
শিশিরকুমার
ব্যারিষ্টার
কলিকাতা

ডাঃ শরৎকুমারের বংশ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ্' পত্রে (Indian Daily News) ১৯১৩ খৃঃ ২৮এ জানুয়ারী তারিখে এই পরিচয়-কথাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—"রায় বাহাদুর অভয়চরণ মল্লিক ইছাপুরের জমিদার শিবপ্রসাদ মল্লিকচৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। শিবপ্রসাদের মৃত্যুর পর 'চৌধুরী' উপাধিটীর ব্যবহার এই মল্লিক-বংশ ত্যাগ করেন। শিবপ্রসাদের আরও দুই ভাই ছিলেন। ইঁহারা তিন জনে মিলিত হইয়া লক্ষ টাকা মূল্যে তাঁহাদের জমিদারী বিক্রয় করেন; এবং মেসার্স পামার এণ্ড কোং'র নিকট এই টাকা জমা রাখেন। এই কোম্পানি ১৮৩১ সালে উঠিয়া যাওয়ায় ইঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হন। ১৮৩৭ সালে শিবপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র বাবু অভয়চরণ মল্লিক এল, পি এর বোর্ড অব্ রেভিনিউএর সিনিয়র মেম্বর মিঃ জেম্স্ পাটেল্এর সুপারিশে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে অধিষ্ঠিত হন। 'স্কুল-সোসাইটি'র বিদ্যালয়ে অভয়চরণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি ইংরাজি ভাষায় প্রাঞ্জল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি ঢাকারও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। অভয়চরণের আবাস-বাটী ৬৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে, যেখানে তাহার পুত্র অবিনাশচরণ মল্লিকের পুত্রগণ বাস করেন। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়ের পিতা অতুলচরণ মল্লিক প্রথমে ভাগলপুরের উকিল ছিলেন। সেখানে তাঁহার ওকালতির প্রতিপত্তি ও প্রসার যথেষ্ট হইয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি সপরিবারে বিলাত-যাত্রা করেন এবং ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাগত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অধিককাল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতে পারেন নাই।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে' উল্লিখিত ৬৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অভয়চরণ মল্লিক মহাশয়ের কলিকাতার আবাস-বাটীর

একাংশে—৬৭ বি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনাদি মধ্যে মধ্যে হইতেছে—কায়স্থ সভার বর্ত্তমান কার্য্যালয়ের উত্তর দিকে এই বাটী অবস্থিত। প্রবন্ধ-লেখক সপরিবারে এই চিকিৎসক-শিরোমণির সহিত ঘনিষ্টভাবে স্নেহাবদ্ধ এবং তাঁহার সৌজন্য, অমায়িক ব্যবহার ও সুচিকিৎসার গুণ এই দত্ত-পরিবারের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত থাকিবে। ইছাপুরের এই বসু-মল্লিক-বংশ সুবিখ্যাত মথুরাবাটীর বসু-মল্লিক পরিবারের শাখা। সমাজে ইঁহারা সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থরূপে মর্য্যাদার অধিকারী। কুলে-শীলে, মানে-সম্ভ্রমে, শিক্ষায়-সৌজন্যে এই বংশ আপামর সাধারণের আদরণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

সঙ্গীতাচার্য্য

দক্ষিণাচরণ সেন*

বঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীতাচার্য্য বাগ্দেবীর বরপুত্র বাঙ্গালার সঙ্গীত-সরস্বতীর অঞ্চলের শেষনিধি সঙ্গীত-কুঞ্জের পিক-শ্রেষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় সেদিন দেশকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। অল্পদিন মধ্যেই আমরা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতাচার্য্য, সঙ্গীত-কলা-বিশারদ দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয়কে (বিগত রবিবার, ২৯এ চৈত্র, ১২ই এপ্রেল, ১৯২৫) মধ্যাহ্ন একটার সময় হারাইলাম। বঙ্গের সঙ্গীত-শাস্ত্রালাপ-বিভাগে কি কণ্ঠ-সঙ্গীতে কি যন্ত্র-সঙ্গীতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রভাব ও কৃতিত্বের যথেষ্ট সুযশের কথা শুনিতে পাই। আধুনিক কালের সঙ্গীতাচার্য্যগণের প্রথম ও প্রধান, 'যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা' প্রভৃতি নানা সঙ্গীতগ্রন্থ-প্রণেতা ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নাম সঙ্গীত-অনুশীলনকারিগণের নিকট সুপরিচিত। আর ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার 'গীতি-সূত্র' নামক পুস্তকের কথা উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক। মৃদঙ্গাচার্য্য ৺শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম ভারত-বিখ্যাত। পশ্চিম বঙ্গের বিষ্ণুপুর নামক সুবিখ্যাত গ্রাম বহু সঙ্গীত কলাবিদ্‌গণের প্রসূতি। অধ্যাপক ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে যদুভট্ট. ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুলো গোপাল), ৺অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৺মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺রাখালচন্দ্র হালদার, সঙ্গীত-নায়ক রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ৺মোহনচাঁদ বসু, (মোহনচাঁদী-সুর নামক অপূর্ব্ব মিশ্র-রাগিণীর উদ্ভব-কর্ত্তা)

* কায়স্থ পত্রিকা—১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩২

৺রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ৺কেশবচন্দ্র মিত্র (মৃদঙ্গ-বিশারদ) প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম সসম্ভ্রমে এখনও উচ্চারিত হয়। অন্যান্য জাতীয়গণের মধ্যে ৺যদুনাথ পাল, মৃদঙ্গাচার্য্য ৺মুরারীমোহন গুপ্ত ও ঢাকা-নিবাসী ৺অবনীমোহন সেন মহাশয়গণের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই সঙ্গীতের আচার্য্য ও শিক্ষক। কলিকাতায় দেশীয়গণের দ্বারা প্রথম যে দেশীয় একতান-বাদ্য-সম্প্রদায় গঠিত হয়, ৺জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উল্লিখিত সঙ্গীতাচার্য্য ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও ৺যদুনাথ পাল মহাশয়গণই উহার প্রবর্ত্তক। রাজা ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদিগের আলোচ্য ৺দক্ষিণাচরণ সেন, ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (নন্তি বাবু) ৺ননীলাল নিয়োগী, শ্রেষ্ঠ বংশী-বিশারদ ৺অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত) ও ব্যায়ামাচার্য্য সলিসিটার শ্রীযুক্ত গৌরহরি মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ কলিকাতায় যন্ত্র-সঙ্গীতালাপ প্রবর্ত্তনের জন্য অশেষ পরিশ্রম করিয়া স্বনামধন্য হইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য অধুনা পরলোকগত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় কলিকাতায়, তথা বঙ্গদেশে, এই ঐক্যতান-বাদন-প্রচলন-উদ্দেশে সারা জীবন-ব্যাপী পরিশ্রম করিয়া সঙ্গীত-সরস্বতীর একনিষ্ঠ-সাধনায় সাধকরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালার সঙ্গীত-সমাজে সঙ্গীত-সরস্বতীর বরপুত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম নীলাম্বর সেন। নীলাম্বরবাবু কলিকাতায় শোভাবাজার অঞ্চলে তাঁহার মাতামহাশ্রমে থাকিয়া যোগ্যতার সহিত পুলিশ ইন্সপেক্টারের কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হয়েন এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে মাতামহের বাস-ভবনাদি প্রাপ্ত হ'ন। পিতার এই মাতামহাশ্রমেই দক্ষিণাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণাচরণ বারাসতের সন্নিকটস্থ মহেশ্বরপুর গ্রামে ১২৬৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৬০ খৃঃ) তাঁহার পিত্রালয়েই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে কলিকাতার 'ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী' (Oriental Seminary)নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা

লাভ করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ বর্দ্ধিত হওয়ায় বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীতকলা-শিক্ষার্থিরূপে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি শোভাবাজারের ৺নন্দরাম সেন মহাশয় প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর মন্দির নামক সুবৃহৎ শিব-মন্দিরস্থ সঙ্গীতাভ্যাস শিক্ষালয়ে দক্ষিণাচরণকে লইয়া যান। কিছুদিন পরে দক্ষিণাচরণবাবু রাজা ৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নাম কলিকাতার, তথা বঙ্গের, সঙ্গীত-চর্চ্চা-বিভাগে চিরস্মরণীয় ও চিরপূজ্য। তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভা, সঙ্গীত-প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টার গৌরব দিনে দিনে এত সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল যে, জগতের সমস্ত সভ্যসমাজের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতালয় ও সঙ্গীতাধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক রাজা সৌরীন্দ্রমোহন বিশেষরূপে সম্মানিত ও উপাধি-ভূষিত হন। তিনিই প্রথমে 'সঙ্গীত-ডাক্তার' ও 'সঙ্গীত-নায়ক'-রূপে বাঙ্গালা দেশের নাম উজ্জ্বল করেন। সঙ্গীত-বিষয়ে ইঁহার সকল উপাধিগুলি একত্র লিখিলে, 'কায়স্থ পত্রিকা'র চার-পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী হইবে। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্গীতাচার্য্য ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিই কণ্ঠ-শিরা-সঞ্চালন-সাহায্যে সাপুড়িয়াদের তুবড়ি-যন্ত্রের ন্যায় 'ন্যাস-তরঙ্গ' নামক এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র আলাপ করা অত্যন্ত কঠিন এবং সংযমী সঙ্গীত-যোগী ব্যতীত সাধারণের এই যন্ত্র আলাপ করিবার শক্তিলাভ করা সুদূরপরাহত। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীর খ্যাতনামা যন্ত্র-সঙ্গীত-বিশারদ ও স্থানীয় সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের শিক্ষক ৺রাজকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় নিভৃতে নিজের চেষ্টায় এই যন্ত্রের আলাপ শিক্ষা করিতেন দেখা গিয়াছিল। কলিকাতায় এই সময়ের আর একজন সুবিখ্যাত যন্ত্র-বিশারদ বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম ও তাঁহার কৃতিত্বের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি 'হারমোনিয়ম' নামক বিলাতী বাদ্য-যন্ত্রের

মধ্যে নূতন 'রীড্' সংযোগ করিয়া ভারতীয় রাগিণীর 'গিট্‌কিরী'র আলাপ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যন্ত্র-সঙ্গীতে ইঁহার অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ছিল এবং বহু যন্ত্রালাপে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দেশীয় কয়েকটী যন্ত্রের ব্যবহার ও পরিচালনা যাহাতে সুলভ হয়, তাহার জন্যও ইনি বহু শ্রম করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবুও বহুযন্ত্র-বিশারদ।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক মদন-মোহন বর্ম্মণ ও বেহালা-শিক্ষক চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে সঙ্গীতের নানা বিষয়ে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়া দক্ষিণাচরণবাবু নিজ মনীষায় বাঙ্গালা সঙ্গীত-প্রণালীতে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের একতান প্রবর্ত্তন করেন। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা না থাকিলে সঙ্গীতে এরূপ নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রবর্ত্তন সাধারণে সম্ভবে না। এই সময়ে ইনি একটী সম্প্রদায় গঠন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সংযোগে তাঁহার নবাবিষ্কৃত পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এই সময় পাথুরিয়াঘাটার জমিদার ৺গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় দক্ষিণাচরণ-বাবুকে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের একটী সমষ্টি দান করেন। ১৮৮৩ খৃঃ দক্ষিণা-বাবু 'ব্লু রিবন অরকেষ্ট্রা' (Blue Ribbon Orchestra) নামক যন্ত্র-সঙ্গীত-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু শিক্ষার্থী ও শিষ্যসহ তাঁহার হৃদ্‌গত সঙ্গীত-সাধনার ব্যবহার ও প্রচলন আরম্ভ করেন। এই সম্প্রদায় অদ্যাবধিও বর্ত্তমান। কুমারটুলির মিত্রবংশীয় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়-প্রমুখ তাঁহার কয়েকজন শিষ্য এখনও এই সম্প্রদায় পরিচালনা করিতেছেন। কিছুদিন পরে ইনি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের লইয়া 'ষ্ট্রীং ব্যাণ্ড' (String Band) নামক একটী সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়টীও বহুদিন জীবিত ছিল। পরে ১৮৯৬ খৃঃ বহুবাজারে 'ফিল্ হারমোনিক ব্যাণ্ড' (Philharmonic Band) নামক একটী সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী-দ্বারা বিদেশীয় পিত্তল-নির্ম্মিত বাদ্য-যন্ত্রসমূহে ইংরাজী রাগিণী একতানে আলাপ করেন। এই

আলাপ প্রবর্ত্তনে দক্ষিণাচরণবাবুর এত অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল যে, তাঁহার স্থানীয় পরমোৎসাহী শিষ্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র-মহাশয় কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় এখনও পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতার সুবিখ্যাত 'ষ্টার' ও 'কোহিনুর' রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণাচরণবাবুর সম্প্রদায় বহুদিন সঙ্গীতালাপ করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গীত গানগুলির সহিত একতানে বংশী প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের আলাপ প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি বহু সুযশ অর্জ্জন করেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় ব্যয়বাহুল্যবশতঃ কলিকাতার রঙ্গালয়সমূহে এই সঙ্গীতালাপন বহুদিন চালাইতে পারেন নাই।

অধ্যাপক দক্ষিণাচরণ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে সানাই, তুব্ড়ি, সারঙ্গ্ প্রভৃতি দেশীয় বাদ্য-যন্ত্রের সমবায়ে এক স্বদেশী বাদ্য-সম্প্রদায় মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের পরামর্শে ও সঙ্গীত-প্রেমিক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ প্রচেষ্টা ও আয়োজনে গঠিত করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়কে শুনাইবার জন্য 'পেজেণ্ট সো' (Pageant Show) মধ্যে অভিনয় করেন। ইহা এত মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সম্রাটের আদেশে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদে ইহার পুনরভিনয় হয়। বড়লাট বাহাদুরের ভবনের বাদ্য-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ মিঃ বেচেনার (Mr. Bachener) প্রমুখ সঙ্গীতকলা ধুরন্ধরগণ এই বাদ্য-সম্প্রদায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া একখানি প্রশংসা-পত্র দেন। বিগত স্বদেশী-মেলার প্রদর্শনীতে এই সম্প্রদায়ই সানাই বাদ্য আলাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। যে অনুন্নত-জাতি বঙ্গে এখনও সানাই, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাজাইয়া থাকে, কলিকাতাস্থ সেইরূপ একটী সম্প্রদায় দক্ষিণাচরণবাবুর শিক্ষায় এখনও কলিকাতার বিবাহ-শোভাযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে এই স্বদেশী বাজনা

বাজাইতেছে। কায়স্থ-সভার শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা-উৎসবে এই স্বদেশী বাজনা বাজিয়াছিল। বেলুড়ের রামকৃষ্ণ-মহোৎসবে বিগত আট-দশ বৎসর দক্ষিণাচরণের পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় সানন্দে বাজনা বাজাইয়া অসংখ্য জনস্রোতকে মুগ্ধ করিতেছেন। বর্ত্তমানে দক্ষিণাচরণবাবুর একতান-বাদন-সম্প্রদায় 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্' পরিচালিত 'ষ্টার থিয়েটারে' নিযুক্ত আছেন।

সঙ্গীতাচার্য্য দক্ষিণাচরণ সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার 'ঐকতানিক স্বর-সংগ্রহ' (১ম ও ২য় ভাগ) 'গীত শিক্ষা' (১ম ও ২য় ভাগ) 'সরল হারমোনিয়ম সূত্র', ও 'হারমোনিয়মে গান-শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্গীত-শিক্ষার্থিগণের বিশেষ অবলম্বনীয়। তাঁহার শেষ রচনা 'গান, গৎ ও আলাপ সংবলিত রাগের গঠন-শিক্ষা' নামক পুস্তকে রাগ-রাগিণীর প্রকৃত উপপত্তি এবং যাবতীয় মূল সূত্র ও সাধনোপদেশ-সংবলিত রাগের গঠন-শিক্ষার সহজ উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথমভাগ তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ভাগের রচনার অধিকাংশের ছাপাও রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি দক্ষিণাচরণবাবুর শিষ্যগণ অচিরে এই খণ্ড প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের গুরুদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবেন ও এই পুস্তকে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিবেন।

দক্ষিণাচরণবাবুর ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল—ব্যবহার অমায়িক, এমন কি, এই সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন ব্যক্তিকে যথার্থ ই অজাতশত্রু বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা যে মাত্র সঙ্গীতেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে—নানা বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।

প্রবন্ধ-লেখক আচার্য্য দক্ষিণাচরণের প্রতিবেশী বলিয়া তাঁহার অনেক স্নেহ-ভালবাসা এবং তাঁহার গ্রন্থাদির সাদরোপহার পাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে। এইরূপ সঙ্গীতাচার্য্যকে হারাইয়া বঙ্গমাতা যথার্থ ই

রত্নহারা হইলেন। হে সঙ্গীতাচার্য্য, বঙ্গীয় সঙ্গীত-সরস্বতীর বরপুত্র, অমরার অমর সঙ্গীতালয়ে তোমার ন্যায় উচ্চ সাধকের উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই! তোমার সরল অমায়িক সর্ব্বজনপ্রিয় মধুর চরিত্র ও সঙ্গীত সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধনা—তোমার শিষ্যগণের ও স্বজাতীয়গণের অনুকরণীয় আদর্শ হউক! এই গীতোচিত-কণ্ঠহীনের জয়-গান তোমার সর্ব্বগ্রাহী কর্ণকুহরে অতি ক্ষীণ হইলেও শ্রদ্ধা-সংবলিত বলিয়া প্রবেশ করুক—ইহাই দীনের প্রার্থনা!

কালীনাথ মিত্র, সি-আই-ই*

মনীষী কালীনাথ মিত্র মহাশয় বিগত সোমবার, ২৭এ মাঘ ১৩৩১, সালে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাকালাবধি বহু বৎসর পর্য্যন্ত সুধীবর কালীনাথবাবুর সুপরামর্শে ও নানা সাহায্যে 'কায়স্থ-সভা' পুষ্ট হইয়াছিল। ১৯০১ সালের রিজ্‌লি সাহেবের লোক-গণনা-বিবরণ-মধ্যস্থ ভারতীয় বিভিন্ন জাতির স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে নানা আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় ২০এ আষাঢ়, ১৩০৮ সাল (৫ই জুলাই, ১৯০১) কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল অফিসে মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জাতি-বিচার-সভা আহূত হয়। সেই সভায় প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে কায়স্থ অথবা বৈদ্য, এই দুই জাতির মধ্যে কাহার স্থান অগ্রে হইবে তাহা লইয়া ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। 'মিরার'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ

* কায়স্থ পত্রিকা, বৈশাখ—১৩৩২

সেন, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের অনুগামী শোভাবাজারের মহারাজ স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বৈদ্য-পক্ষ এবং 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণ কায়স্থ-পক্ষ সমর্থন করেন।

১৩০৮ সালের রবিবার, ৯ই ভাদ্র (২৫এ, আগষ্ট ১৯০১) পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় মহাত্মা রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে বঙ্গীয় কায়স্থের চারি শ্রেণীর যে মহতী সভা আহূত হয়, স্বর্গীয় কালীনাথবাবু সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্যে বিশেষভাবে যোগদান করেন। ঐ সভা হইতে রিজলী সাহেবের ১৯০১ সালের লোক-গণনা-বিবরণ-মধ্যস্থ বিভিন্ন জাতির স্থান নির্ণয়ের প্রতিবাদ করা হয় এবং ঐ প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে এক আবেদন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের কায়স্থ-জাতির বর্ণ ও স্থান নির্ণয় সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা-পত্রের অনুলিপি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। এই সভায় কালীনাথ-বাবু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় পশুপতিনাথ বসু, রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন সোম ও যোগেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ মিত্র, ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ মিলিত হইয়া কায়স্থ-সমাজের উন্নতি ও চারি সমাজের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বঙ্গদেশে সকল কায়স্থ-কেন্দ্রের সহিত একযোগে যাহাতে এই সভা কার্য্য করিতে পারেন ও সামাজিক কায়স্থমাত্রেই যাহাতে এই জাতীয় সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন, তৎপক্ষে সকলেই যত্ন করিবেন ইহাও স্থিরীকৃত হয়। কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা হইতেই কালীনাথবাবু এই ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উত্তরকালেও বহু সুপরামর্শ দান করিয়া সভার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করিতেন।

বহু বৎসর কালীনাথবাবু কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য

ছিলেন এবং সহকারী সভাপতিও হইয়াছিলেন। নিম্নে ইঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় কথা, আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম ;—

কালীনাথবাবুর পিতার নাম ৺মাধবচন্দ্র মিত্র—ইঁহারা বিশিষ্ট কুলীন কায়স্থবংশসম্ভূত। কালীনাথবাবু হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে সাধারণ শিক্ষালাভ করেন। পরে এটর্নি মিষ্টার এইচ, ই, সিম্‌স সাহেবের অফিসে 'আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক' হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি এটর্নি হন এবং পরে সিম্‌স্‌ সাহেবের আফিসে অংশীদার-রূপে গৃহীত হন। ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ঐ অফিসে অংশীদার থাকিয়া এটর্নির কার্য্য পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খৃঃ ২৭শে জুলাই তিনি হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৯৩ খৃঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে অংশীদার-রূপে গ্রহণ করেন এবং শেষ দুই বৎসর ব্যতীত দেবপ্রসাদবাবুর সহিত কার্য্য করিয়া 'মিত্র ও সর্ব্বাধিকারী' নামক এটর্নি-ফারমের নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল এই দুই ফার্‌ম পৃথক হইয়াছে। তিনি পঞ্চাশ বৎসর এটর্নির কার্য্য চালাইবার পর তাঁহার ব্যবসায়ের 'জুবিলি' উদ্দেশে তাঁহাকে সকল এটর্নি, জজ প্রভৃতি আইনজ্ঞগণ মিলিত হইয়া অভিনন্দিত করেন। হাইকোর্টের জজমহোদয়গণ সকলেই ইহাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও যথেষ্ট সম্মান দিতেন।

কালীনাথবাবু দেশের নানা সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসন্‌' নামক বিখ্যাত সভার তিনি ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তেইশ বৎসর কাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ছিলেন এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী সেবায় কলিকাতা নগরীর বহু মঙ্গল-সাধন-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কলিকাতা সহরের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত মত-দ্বৈধ হওয়ায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর যে আটাশ জন কমিশনার পদত্যাগ

করেন, কালীনাথবাবু তাঁহাদের অন্যতম। পরে তিনি 'বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলে'র সদস্য হন। এই সময়ে ১৮৯৯ খৃঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হয়। চুঙ্গীর কর (Octroi) সম্বন্ধে ইনি অনেক পরিশ্রম করেন। 'এলবার্ট ভিক্টর হস্‌পিট্যাল' ফণ্ডের সহযোগী সম্পাদক (Joint Secy.) ছিলেন। খরচ দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্বতন্ত্র স্থান পাইবার বন্দোবস্তে ইনি বিশেষ উদ্যোক্তা। ভগবানদাস বগ্‌লা মাড়োয়ারী হাসপাতালের ইনি সভাপতি ছিলেন। স্যার আলেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জির প্রবর্ত্তিত কলিকাতা সহরের বিল্ডিং কমিটীর অন্যতম সভ্য হয়েন। কালীনাথবাবু অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকিয়া যে কোর্টে কেহ বসিবেন, সেই কোর্টে ওকালতি বা এটর্নির কার্য্য করিতে তিনি পারিবেন না, এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কালীনাথবাবু অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেন। কলিকাতার তিন নম্বর ওয়ার্ডে করদাতা-সঙ্ঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। 'ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব', 'বৈষ্ণবপাড়া শীতলাতলা সঙ্ঘ' ও 'সিমুলিয়া হরি-সেবক-সমিতি' প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ও সদনুষ্ঠানের কালীনাথবাবু সভাপতি ও পরিচালক ছিলেন। এটর্নির কার্য্য করিয়া তিনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন এবং তাঁহার এটর্নির আফিস একটী সভ্রান্ত আইন ব্যবসায়ীদের কার্য্যালয় বলিয়া বিখ্যাত। বহু পুত্রপৌত্রাদিপূর্ণ এক বৃহৎ সংসারের নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন ইনি নিজ পরিশ্রমের ফলে করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শেষ বয়সে স্ত্রী, দুই পুত্র ও অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়কে হারাইয়া ইনি বিশেষ সন্তপ্ত হন। কিন্তু, আনন্দের কথা—জীবনের প্রায় শেষদিন পর্য্যন্ত কালীনাথবাবু কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। এরূপ আদর্শ কর্ম্মী, উদ্যোগী, স্বাবলম্বী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ধীমান, জনহিতকামী পুরুষ বর্ত্তমানকালে বিরল। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং পূজা-অর্চ্চনাদি ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত আজীবন সম্পন্ন

করিতেন ও এই সকল পূজার্চ্চনা উপলক্ষ্যে বহু লোকসেবা করিতেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা তাঁহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, কায়স্থজাতি শ্রীহীন। তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়ও পিতার আদর্শ অনুকরণ করিয়া বিশেষ কৃতী ও সম্মানিত হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী*

বঙ্গজ কায়স্থকুলচূড়ামণি, 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার' বিরাট্-স্তম্ভ, দেশমাতার অন্যতম বরেণ্য সুসন্তান, বাঙ্গালীর অলঙ্কার, কায়স্থ-প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ, কায়স্থ-জাতির গৌরবস্থল, শাস্ত্র-শ্রদ্ধাপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব-প্রকৃতিবিশিষ্ট, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ধুরন্ধর, 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে'র কর্ণধার, রাজনীতি-বিশারদ, অনন্যসাধারণ মনীষাসম্পন্ন, প্রখ্যাতনামা দার্শনিক, দেশ-সেবক, পুরাতন বাঙ্গালীর আদর্শ, বর্ত্তমান শিক্ষিতসমাজের অন্যতম নায়ক, পুরাতন ও নবীনের সংযোগসেতু, বহু শুভানুষ্ঠানের অগ্রণী ও প্রবর্ত্তক, কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রেম-দয়া-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন আদর্শ চরিত্র, অজাতশত্রু, টাকীর সুপ্রসিদ্ধ মুন্সীবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন রায় যতীন্দ্রনাথ (গুহ) চৌধুরী

* পত্রিকা-সম্পাদনকালে সম্পাদক কর্ত্তৃক শোক-প্রকাশ—'কায়স্থ পত্রিকা,' ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩২

শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় বিগত বুধবার, ২৪এ চৈত্র, ১৩৩২ (ইংরাজি ৭ই এপ্রেল, ১৯২৬), সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় সন্ন্যাস-রোগাক্রান্ত হইয়া বরাহনগরস্থ সুপরিচিত মুন্সী-ভবনে অকালে আকস্মিক-ভাবে দেশবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া সাধনোচিত-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধাররূপে আজন্ম সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই কায়স্থকুলকেশরী, বীর, ধীর, মহাপ্রাণ রায় যতীন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান দারুণ দুঃসময়ে এ-রূপ বিজ্ঞ বহুদর্শী কর্ম্মী ও পরামর্শদাতার অভাব অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহার পরলোকগমনে দশের ও দেশের, বিশেষতঃ, কায়স্থ-জাতির যে সমূহ ক্ষতি হইল, তাহা কত দিনে পূরণ হইবে বলা যায় না। আমরা শোকাক্রান্ত হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে এই প্রেমময় মহাত্মার চিরপুণ্যময়ী স্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। হে প্রিয়দর্শন, সৌম্য, শান্ত, প্রেমিক, পুণ্যচরিত্র, স্বজাতিবৎসল, তোমার পূত আদর্শ আমাদের স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে! তোমার প্রেমপূত-আত্মা, তোমার অভীষ্ট-দেবতা পরমাত্মার সান্নিধ্য-লাভ করিয়া লীলারস-সম্ভোগ করিতে থাকুক—ইহাই—গুণমুগ্ধ, স্নেহপুষ্ট, বিয়োগ-বিধুর দীনের প্রার্থনা!

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ-পরিচয়

১। বন্দনা—(কবিতাবলী ও গাথাবলী) মূল্য—১॥০

২। সাধনা—(শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিচয়, তত্ত্ব ও গীতাবলী) মূল্য—॥০

৩। Girish Chandra Ghose—A Biographical Sketch—Price 1 anna.

৪। সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি—মূল্য—দু' ফোঁটা অশ্রু

৫। অর্চ্চনা—(কবিতাবলী) মূল্য—এক টাকা

৬। আরাধনা—(গীতাবলী)

৭। আলোচনা (পুস্তক-পরিচয়)

৮। বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাথমিক ইতিহাস

৬।৭।৮ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

কালীকৃষ্ণ-কথা (লেখকের পুত্রের স্মৃতি)

'সঙ্ঘ' হইতে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—

লক্ষ্মী-নিবাস—১, লক্ষ্মী দত্ত লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা